খুজি

মুহসিন আবদুর রহমান

প্লেনে ভ্রমণ আমার কাছে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রখ্যাত লেখক-সাংবাদিক যাযাবর (ছদ্মনাম) তার লেখা দৃষ্টিপাত বইতে বিমান ভ্রমণ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন আধুনিক বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। কথাটা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস এবং আপাদমস্তক উপলব্ধি করি। যাযাবরের কথার খেই ধরে বলতে চাই, বিমান দিয়েছে গতি, কিন্তু বাড়িয়ে দিয়েছে দুর্গতি।

বিমান ভ্রমণ আমার মধ্যে কোনো শিহরণ তো সৃষ্টি করেই না, বরং এর আবেগহীন রকমারি-ঝকমারি আমাকে নিরন্তর বিরক্তি ও উৎকণ্ঠার মধ্যে ঠেলে দেয়। প্রথমত. টিকেট সংগ্রহ করাই এক ঝক্কি। বার বার ধরণা দিয়ে হাত-পায়ে ধরে বুকিং করা ও টিকেট পাওয়া এক চরম দুর্ভোগের এবং পরম ভাগ্যের ব্যাপার।

টিকেট কিনেই শেষ নয়, তা আবার কনফার্ম করতে হবে।

কনফার্ম করার পর রিকনফার্ম।

তারপর যাত্রার দিন শহর ছেড়ে বহুদূরে অবস্থিত এয়ারপোর্টে বিমান ছাড়ার নির্ধারিত সময়ের দুই তিন ঘণ্টা আগে পৌছে বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতের ভঙ্গিতে নিজেকে সম্পূর্ণ সপে দিতে হবে।

তারপরই শুরু হয়ে যাবে তুলকালাম কাণ্ড। লেগে যাবে টানা হেচড়া। ঘাটে-অঘাটে এটা করো, ওটা ধরো, সেটা ছাড়ো, এটা ঠেলো, ওটা টানো, এটা ওঠাও, ওটা নামাও, এটা লেখো, ওটা কাটো, এটা দেখো, ওটা দেখাও। কতো রকমের চেকিং, কতো রকমের বায়নাক্কা। গাট্টিবোচকা তো আছেই, দেহের এমন স্থান নেই যেখানে তারা চেকিং করার নামে খোচা, সুড়সুড়ি ও কাতুকুতু না দেবে। নাজেহালের একশেষ।

প্রতি পদক্ষেপে ভ্রূকুটি আর সন্দেহ যেন আমি এক দাগী আসামি। ব্যাপারটা অবশ্যই অভদ্র ও চরম অবমাননাকর। লাঞ্ছনার এখানেই শেষ নয়। চেকিং ফেকিংয়ের এ দুস্তর পথ অতিক্রম করে উড়োজাহাজের খোলের মধ্যে বসতে না বসতেই কোমরে দড়ি। যাকে বলে সিটবেল্ট। আমি যেন ধরা পড়া পলাতক জেল কয়েদি, আবারও পলায়ন উদ্যত। ফাসেন ইওর সিটবেল্ট (এর্ট্রণভ হমলর্ ণর্টঠণর্ফ, সিটবেল্ট বেধে নাও) বলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে ফেলা। অপদস্থের চূড়ান্ত।

কিন্তু আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে অবস্থা এমন ছিল না। আমি তখন আমেরিকান এমবাসির চাকরি নিয়ে জয়েন করেছি ঢাকার কনসুলেট অফিসে। মাস তিনেক পর শুনি, আমাকে পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচি যেতে হবে। প্লেনের টিকেট ওরাই কিনে দিল, ফার্স্ট ক্লাসের। এর আগে কখনো প্লেনে উঠিনি। প্লেনেও যে ফাস্ট ক্লাস আছে তাও জানতাম না।

আজকাল প্লেনে চড়ে পৃথিবীর এখানে-সেখানে উড়ে যাওয়াটা ডাল-ভাত হয়ে গেছে। কিন্তু আগে প্লেনে উঠে দূর দেশে যাওয়াটা ছিল রীতিমতো একটা ব্যাপার।

আমার করাচি গমন পরিবারের সবার কাছে দারুণ একটা ঘটনা হয়ে উঠলো। আমাকে

সি-অফ করতে বাবা-মাসহ অনেকেই এয়ারপোর্টে হাজির হলেন। মা তো ভয়ে অস্থির, কিছুতেই প্লেনে উঠতে দেবেন না।

তাকে লুকিয়ে এক সময় প্লেনের সিড়ি বেয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়েই বাধা। প্রবেশ পথের মাথায় ফার্স্ট ক্লাস লেখা দেখে সেমুখী হয়ে যখন ঢুকতে গেছি, সুন্দরী তরুণী এয়ারহস্টেস বাধা দিয়ে সবিনয়ে বললেন, মাফ করবেন, এটা ফার্স্ট ক্লাস।

মেয়েটার ইংরেজি উচ্চারণ সুন্দর এবং কণ্ঠস্বর কোমল। তবুও আমার কান গরম হয়ে উঠলো। মেয়েটাকে দোষারোপ করে লাভ নেই। আমার ডার্ক ব্রাউন রঙের চেহারার যে মানচিত্র তা দেখে প্লেনে ওঠার অনুপযুক্ত ভেবে আমাকে যে সিড়ির গোড়াতেই গলা ধাক্কা দেয়নি সেটাই ভাগ্য। আর সেই আমিই কি না ফার্স্ট ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছি বেকুবের মতো। নিজের চেহারাটাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়ে, মনের কষ্ট মনে চেপে রেখে, হাসির চেষ্টায় মুখটা বিকৃত করে বললাম, আমার কাছে ফার্স্ট ক্লাসের টিকেটই আছে।

মেয়েটা ফর্শা ও ভদ্র। তাই লাল হয়ে গেলেন এবং সম্ভবত তার অসৌজন্যমূলক আচরণের খেসারত দেয়ার অভিপ্রায়েই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমার নির্ধারিত আসনে বসিয়ে মিষ্টি হাসি হাসলেন।

আমি তখন অবিবাহিত যুবক। সুন্দরী তরুণীর ওই মিষ্টি হাসি দেখে আমার অন্তরের বেবাক জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

তখন ঢাকা এয়ারপোর্ট ছিল তেজগাওয়ে যাকে এখন পুরনো এয়ারপোর্ট বলা হয়। কেউ কেউ তখন এটাকে বলতো তেজগাও এয়ারপোর্ট। বর্তমানে এ দালানেই পাবলিক সার্ভিস কমিশন অফিস। সে আমলে ওই এয়ারপোর্টে ঢোকায় তেমন কোনো কড়াকড়ি ছিল না। বিমানযাত্রীদের এখনকার মতো কৃমিনাল মনে করা হতো না। যেখানে প্লেন ল্যান্ড করতো সেখানে প্লেনের প্রায় কাছাকাছি যেতে দর্শকদের তেমন বাধা ছিল না। ব্যাপারটা ছিল অনেকটা রেল স্টেশনের মতো।

জানালার পাশেই আমার সিট। প্লেন তখন উড্ডীয়মান হবার পায়তারা করছে। কোমরে বেল্ট বেধে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, আমার

সহজ-সরল মা এয়ারপোর্টের মাটিতে সেজদায় পড়ে আছেন। অন্যরা তাকে সামলাতে ব্যস্ত। আমার বুকটা চুরমার হয়ে যেতে লাগলো।

এরপর বহু বছর কেটে গেছে। আমার বাবা-মা জান্নাতবাসী হয়েছেন। আমার স্ত্রীও মারা গেছেন। আমার দুটোই সন্তান। দুটোই ছেলে। ছোট ছেলে যখন ক্লাস নাইনের ছাত্র এবং বড় ছেলে নৌবাহিনীর লেফটেনান্ট কমান্ডার তখন তারাও আট বছরের ব্যবধানে আমাকে ছেড়ে তাদের মায়ের কাছে চলে গেছে।

এখন মাঝে মধ্যে প্লেনে চড়লে প্লেনের ছোট্ট জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবি, আমার প্রয়াত প্রিয়জনরা পৃথিবী ছেড়ে এ মহাশূন্যের কোথাও কি আছে? তাদের কি হঠাৎ দেখতে পাবো? আমার সহজ-সরল অবুঝ মা আমার জন্য উতলা হয়ে এ মহাশূন্যের কোথাও এখনো কি সেজদায় পড়ে আছেন?

শ্যামলী, ঢাকা থেকে

হেলিকপ্টার

নুরুজ্জামান

আমি তখন খুব ছোট। এরশাদ ছিলেন প্রেসিডেন্ট। আমাদের সময় কাটতো শাদামাটাভাবে। আব্বা চাকরি করেন। তাই বিএমটিএফ-এর কলোনিতে থাকি। সকালে আমরা কয়েকজন ছাদে দাড়িয়ে আছি। দেখি একটা হেলিকপ্টার প্রচণ্ড শব্দে ধীরে ধীরে সামনের মাঠে নেমে আসছে। এর আগে আকাশে অনেক হেলিকপ্টার, বিমান দেখেছি। দূর আকাশে উড়ে যাচ্ছে। আমরা ছোটরা হাত নেড়ে টাটা দিতাম। কিন্তু সেদিন মাঠে হেলিকপ্টার নেমে আসায় হেলিকপ্টার হেলিকপ্টার বলে চিৎকার করে মাঠে চলে আসি। মহিলারা ছাদে ওঠে।

এক সময় হেলিকপ্টার মাঠে নামে। এর মাথার পাখাগুলো থামে। আমরা হেলিকপ্টারের খুব কাছে চলে যাই। ভেতর থেকে আর্মির দুজন নেমে আসে। এদের কিছু একটা পড়ে গিয়েছিল। তা তারা উড়ন্ত অবস্থায় দুরবিন দিয়ে দেখে। সেটা কিছু দূর থেকে নিয়ে আসে, আমাদের সরে যেতে বলে আর্মির দুজন হেলিকপ্টারে উঠে বসে।

আমরা কিছু দূর গিয়ে দাড়িয়ে থাকি। তখন হেলিকপ্টারের পাখাগুলো জোরে ঘুরতে থাকে। বাতাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় দুই তিনজন মাটিতে পড়ে যাই। অনেকে বসে পড়ে।

এরপর কিছুদিন চলে হেলিকপ্টার নিয়ে নানান গল্প। যারা সেদিন এতো কাছে থেকে দেখেছে তারা গর্বিত আর যারা দেখেনি তারা দুঃখিত হলো।

সেদিন বাতাসের ধাক্কায় যারা মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম তারা বলতাম, বড় হয়ে পাইলট হবো। পাইলট তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত বিমানেই চড়তে পাড়লাম না। আকাশ ভ্রমণও হলো না।

গাজীপুর থেকে

দুই জীবন

মনি অধিকারী

দমদম এয়ারপোর্ট পৌছেই জয়ন্তীকে টেলিফোন করলাম, আমি এসে গেছি। প্রস্তুত হও। যে কোনো সময় বেরিয়ে পড়বো।

পর দিনই জয়ন্তী আমার হোটেলে এলো। প্রোগ্রাম ঠিক করলাম। এবার আমরা যাবো হিমাচল প্রদেশে। আমার ইচ্ছা কলকাতা থেকে কালকা মেল-এ যতোদূর যেতে পারি যাবো। তারপর অন্য ব্যবস্থা। কিন্তু জয়ন্তীর ইচ্ছা অন্য রকম। কলকাতা থেকে প্লেনে দিল্লি। ওখানে কয়েকদিন থাকবো, বেড়াবো। কে এক বান্ধবী দিল্লিতে আছেন তার ওখানে যেতেই হবে। আমি দ্বিমত করিনি। জয়ন্তীর ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। এয়ার ইনডিয়ার টিকেট নেয়া হলো। দুই দিন পর আমাদের ফ্লাইট।

জয়ন্তী আমার বান্ধবী ঠিক তাও নয়। সে আমার বন্ধুর স্ত্রী। তিন বছর হলো আমার বন্ধু প্রশান্ত মারা গেছে। তাদের বিবাহিত জীবন স্থায়ী হয় পাচ বছর। এ পাচ বছরের মধ্যে তিন বছর প্রশান্ত পঙ্গু হয়ে ঘরে পড়েছিল। আমার সঙ্গে জয়ন্তীর পরিচয় প্রশান্ত বেচে থাকতেই। তারপর থেকে প্রতি বছর একবার করে আমি আর জয়ন্তী ইনডিয়ার কোনো না কোনো জায়গায় বেড়িয়ে আসি।

জয়ন্তীর কোনো সন্তান নেই। সে একটা বেসরকারি কলেজের লেকচারার। সংসারে তার বৃদ্ধ শাশুড়ি ছাড়া আর কেউ নেই। শাশুড়ি অনুপমা রায় আমাকে খুবই স্নেহ করেন। এক সময়

প্রশান্তরা আমাদের প্রতিবেশী ছিল। ১৯৬৫ সালে তারা ইনডিয়ায় চলে যায় এবং হুগলি জেলার শেওড়াকুলিতে স্থায়ী হয়। আমি আর প্রশান্ত একসঙ্গে কিছুদিন লেখাপড়া করেছি।

নির্দিষ্ট দিনে, যথাসময়ে আমরা দমদম এয়ারপোর্টের দিকে যাত্রা করলাম। পথেই শুনতে পেলাম প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। রাস্তায় যেখানে সেখানে জটলা, সবার মুখে একই প্রশ্ন এবার কি হবে।

আমরা দ্বিধায় পড়লাম প্লেন কি উড়বে?

যাহোক, এয়ারপোর্টে পৌছালাম। তেমন কোনো পরিবর্তন নেই। প্লেন ঠিকমতোই ওঠানামা করছে। তবে পুলিশের সংখ্যা অন্য সময়ের চেয়ে বেশিই মনে হলো।

আমরা প্লেনে উঠলাম। আমাদের পাশেই বসেছেন এক শিখ দম্পতি। মহিলার কোলে ছয় মাস বয়সের একটি ছেলে। দেখতে খুবই সুন্দর। অল্প সময়ের মধ্যেই জয়ন্তীর সঙ্গে ভদ্র মহিলার ভাব হয়ে গেল। দুজনে খুব গল্পগুজব করছে। বাচ্চাটা জয়ন্তীর কোলে। আগেই বলেছি জয়ন্তী বিধবা, তার কোনো সন্তান নেই। বাচ্চা পেয়ে খুব খুশি।

ভদ্র মহিলা বয়সে জয়ন্তীর থেকে ছোটই হবেন। ভদ্রলোক বেশ গম্ভীর। প্লেনে ওঠার পর থেকেই তাকে খুব বিচলিত মনে হচ্ছে। কি যেন ভাবছেন। ত্রিশ পয়ত্রিশ বছর বয়স। সুন্দর চেহারা। মাথায় লম্বা চুল। পাগড়ি পরেছেন। ঘন দাড়ি জাল দিয়ে আটকানো। পরনে জাতীয় পোশাক। প্লেনের অধিকাংশ যাত্রীই প্রধানমন্ত্রীর হত্যার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন। দুঘণ্টা পর প্লেন দিল্লি পালাম এয়ারপোর্টে নামলো। এ সময়ের মধ্যেই জয়ন্তী এবং শিখ ভদ্র মহিলা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। বাচ্চাটি জয়ন্তীর কোলেই আছে।

প্লেন থেকে নেমে যাত্রীরা লাউঞ্জে এসে লাগেজের জন্যে অপেক্ষা করছে। এখানের পরিবেশ যেন কেমন থমথমে। অনেক পুলিশের আনাগোনা। হঠাৎ মাইকে ঘোষণা এলো কেউ এখন বাইরে বের হবেন না। শহরের অবস্থা ভালো নয়। আপনারা অপেক্ষা করুন। যথাসময়ে আপনাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে দেয়া হবে।

এ সময় আরো অনেক প্লেন দেশ-বিদেশ থেকে এসে গেছে। যাত্রীরা উৎকণ্ঠিত। কতোক্ষণ এখানে আটকে থাকতে হবে। এর মধ্যেই খবর এলো শহরে কিছু দুষ্কৃতিকারী শিখদের ওপর হামলা করেছে। কয়েকজন শিখ ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন। তবে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই। পরিবেশ স্বাভাবিক করার জন্য কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ খবর শুনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শিখদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছে কিভাবে এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যায়। আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোক বেশ ঘাবড়ে গেছেন। তার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। স্ত্রীকে বললেন, আমাদের এ সময় বের হওয়া উচিত হয়নি। কি করবো বুঝতে পারছি না। বাবুকে দেখ।

স্ত্রী তো ভয়ে কাপছে। তার অবস্থা দেখে জয়ন্তী এগিয়ে এসে বাচ্চাকে কাছে নিল। ভদ্রমহিলাকেও সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে।

এয়ারপোর্টে এতো লোক সমাগম হয়েছে যে, বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। কর্তৃপক্ষও ঠিকমতো যাত্রীদের দেখাশোনা করতে পারছে না। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে নানান রকম প্রাণ কাপানো চিৎকার ভেসে আসছে। ট্রাকে করে শ শ লোক *হর হর মহাদেব, জয় মা কালী, জয় মা*

তারা বিভিন্ন রকম স্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হচ্ছে। অন্ধকারে তেমন কিছু দেখা যাচ্ছে না তবে তাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল এবং অস্ত্রশস্ত্র আছে বোঝা যাচ্ছে।

যাত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে শিখ যাত্রীদের মধ্যে ভীতির লক্ষণ প্রকট। রাত দশটায় হঠাৎ ঘোষণা এলো, শিখ ধর্মাবলম্বী যাত্রীরা বের হয়ে আসুন। আপনাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হবে। এ স্থান আপনাদের জন্যে যথেষ্ট নিরাপদ নয়।

বাইরে তিনটা বাস দাড়িয়ে আছে। কয়েকজন পুলিশ বাস তিনটাকে ঘিরে রেখেছেন। শিখ যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে আলাপ–আলোচনা করে লাউঞ্জ থেকে বের হয়ে একে একে বাসে উঠতে যাচ্ছে, কয়েকজন ইতিমধ্যে উঠেও পড়েছেন। আমি এবং জয়ন্তী দুজনেই আমাদের সঙ্গের শিখ দম্পতিকে তুলে দিতে বাসের কাছাকাছি পৌছেছি এমনই সময়ে চার পাচ ট্রাক ভর্তি সন্ত্রাসী ছোরা, দা, ত্রিশূল নিয়ে এয়ারপোর্টের মধ্যে ঢুকে মুহূর্তের মধ্যে দশ বারোজন শিখকে টেনে হেচড়ে ট্রাকে তুললো।

আমাদের সঙ্গের ভদ্রলোককে টেনে নিয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বাচ্চাকে জয়ন্তীর কোলে ফেলে দিয়ে বললো, দিদি বাচ্চুকে দেখ ও তোমাহারা বাচ্চা বলে ছুটে *রুখ যাও ভাইয়া লোক, রুখ যাও ভগবান কা কসম, উসকো ছোড় দো* বলতে বলতে ট্রাকের কাছে এগিয়ে যেতেই কয়েকজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক তাকেও টেনে ট্রাকে তুললো।

পুলিশ প্রথমে ফাকা গুলি ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে কয়েকজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লো। ঘটনাস্থলেই তিনজন প্রাণ হারালো। কিন্তু ততোক্ষণে ট্রাক ভর্তি সন্ত্রাসীরা তাদের নিয়েই পালিয়ে গেছে। কি বিভৎস তাদের চেহারা। সমস্ত শরীরে রক্ত। যাত্রীরা যারা বের হয়ে এসেছিল তারা আবার ফিরে এলো। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই যেন প্রলয় ঘটে গেল। যে সব শিখদের ধরে নিয়ে গেছে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বাচ্চাদের কান্নায়, চিৎকারে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হলো। যাত্রীরা এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে দোষারোপ করছে। কেন তারা যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেই যাত্রীদের এভাবে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিল।

জয়ন্তী বাচ্চা নিয়ে ফিরে এসেছে। তার চলার সাধ্য নেই। আমিই তাকে ধরে এনে বসিয়ে দিলাম। দুচোখে বন্যা বয়ে যাচ্ছে আর বলছে কি হয়ে গেল। এ বাচ্চাকে নিয়ে আমি এখন কি করবো।

বাচ্চার কিন্তু কোনোরকম ভারান্তর নেই। সে জয়ন্তীর কোলেই হাসছে, খেলছে। তার কাছে খবর পৌছেনি কি মর্মান্তিক পরিবর্তন তার জীবনে ঘটে গেল।

দিল্লি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে আরো অনেক যাত্রী এসে গেছে। প্রচুর পুলিশ এয়ারপোর্ট ঘিরে ফেলেছে। নতুন করে আর হাঙ্গামা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু যে পৈশাচিক ঘটনা ঘটে গেল তার দায়িত্ব কে নেবে?

এমনিভাবেই এ কালো রাত্রিও অবসান হলো। কিন্তু কি বিভীষিকাময় রাত যে আমরা পার করলাম তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

কয়েকজন শিখ মহিলা জ্ঞান হারিয়েছেন। অধিকাংশই অসুস্থ। খাবার নেই। এমনকি পানি পর্যন্তও নেই। টয়লেটের অবস্থা আরো করুণ। বাচ্চা নিয়ে জয়ন্তী খুবই অসুবিধার মধ্যে আছে। চারিদিকে ছোটাছুটি করছে কোথায় একটু দুধ পাওয়া যায়। শুধু দুধ পেলেই তো হবে না সেটা খাওয়াতে যে সরঞ্জাম দরকার তাই বা কোথায়।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে খুব ভালো লাগলো। এ সময় জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই সবার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। জয়ন্তী এক মহিলার কাছ থেকে তার বাচ্চার জন্য রাখা দুধ এনে ছেলেকে খাওয়ালো। আরেক মহিলা বাচ্চাকে নিয়ে তার বুকের দুধ খাইয়ে দিল। জানি না তারা হিন্দু না মুসলিম, কৃশ্চিয়ান না শিখ। শুধু বুঝতে পারলাম এরা মা। সকাল আটটায় কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছু নাশতা দিল।

এ সময় খবরের কাগজ এসে গেছে। জানতে পারলাম, শহরে গতকাল ভয়াবহ অবস্থা গেছে। কয়েক হাজার শিখ নিহত হয়েছে। প্রচুর দোকান, বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। পুলিশের গুলিতে মারা গেছে প্রায় পঞ্চাশ দুষ্কৃতকারী। শহরে কারফিউ চলছে। দাঙ্গা পুলিশ টহল দিচ্ছে। দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বারোটায় কারফিউ শিথিল হলে কর্তৃপক্ষ আমাদের হোটেলে নেয়ার ব্যবস্থা করলেন। শিখ যাত্রীরা খেতে চাচ্ছিলেন না। তাদের বোঝানো হলো এবার যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কয়েকজন শিখ তাদের পোশাক পরিবর্তন করলেন। এক শিখ ভদ্র মহিলা তার দশ বারো বছরের ছেলেকে নিয়ে কানাডা থেকে এসেছেন। তাকে নিয়ে তিনি খুবই দুশ্চিন্তায় আছেন। কিছুটা নিরাপত্তার আশায় তিনি এক মসলিম পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন। এ পরিবারে চারজন বোরখা পরা মহিলা এবং একজন পুরুষ। মাথায় টুপি। ওরাও অন্য দেশ থেকে এসেছেন। বের হওয়ার ঠিক আগে দেখলাম, দুজন মুসলিম মহিলা তাদের বোরখা খুলে এক শিখ মহিলাকে, অন্যটি তার ছেলেকে পরিয়ে দিয়ে তাকে মাঝখানে রেখে পরস্পর হাত ধরাধরি করে বাসে উঠলো। আমরাও উঠলাম। বাস ছাড়লো। আগে পেছনে কয়েক শ পুলিশ।

হোলেটেই থাকলাম, পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো দিল্লি থেকে প্রকাশিত প্রতিটি খবরের কাগজ তন্নতন্ন করে খোজা। কোথাও কোনো বিজ্ঞাপন আছে কি না। আমাদের ধারণা, যদি শিখ দম্পতির একজনও জীবিত থাকেন তিনি অবশ্যই কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন। কেননা তারা আমাদের নাম, পরিচয় কিছুই জানেন না যেমন আমরাও তাদের কোনো পরিচয় জানি না। দশ দিনের মধ্যেও যখন এ ধরনের কোনো বিজ্ঞাপন চোখে পড়লো না তখন ধরে নেয়া যায় তাদের কেউ বেচে নেই। তারপর আমরা আগের প্রোগ্রাম বাতিল করে কলকাতায় ফিরে এলাম।

কলকাতায় পৌছেই জয়ন্তী বায়না ধরলো আমি যেন এখনি তার সঙ্গে শেওড়াকুলি যাই। মা বাচ্চা দেখে কি ভাববেন। তিনি এ বাচ্চাকে কিভাবে নেবেন সেটা চিন্তার বিষয়।

আমরা যতোটা ভয় পাচ্ছিলাম, কাকিমা সেরকম কিছুই করলেন না বরং সব শুনে খুশিই হলেন। দুই মহিলা যেন একটা অবলম্বন খুজে পেল। বাচ্চা কি খাবে, কিভাবে থাকবে সব ব্যবস্থা কাকিমা করে ফেললেন। আমি কলকাতায় কয়েক দিন থাকলাম। কয়েকটি কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলাম কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। জয়ন্তী ইতিমধ্যে নিজের নামের সঙ্গে মিল করে ছেলের নাম দিয়েছে জয়ন্ত রায়।

আমার অবাক লাগছে এই ভেবে যে বন্ধু প্রশান্ত যখন পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল তখন কাকিমা তাদের দত্তক নিতে বলেছিলেন কিন্তু জয়ন্তী রাজি হয়নি। অথচ এখন কতো সহজে শিখের বাচ্চাকে আপন করে নিয়েছে।

দুই দশক পার হয়ে গেছে। জয়ন্ত এইচএসসি পাস করে ইনডিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। অল্পদিনের মধ্যেই সফল অফিসার হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। ছেলে যেমন উচু-লম্বা দেখতেও তেমন সুন্দর হয়েছে। জয়ন্তীকে সত্যিই তার মা-ই মনে হয়। মা বেটার চেহারায় অদ্ভুত মিল। জয়ন্ত প্রথম দিকে আমাকে বাবা বলে ডাকতো। একটু বড় হতেই তার ভুল ভেঙে দিয়েছি। এখন সে আমাকে কাকাবাবু ডাকে। বছরে একবারই তার সঙ্গে দেখা হয়। যতোদিন কলকাতায় থাকি সে আমার সঙ্গেই থাকে। এইচএসসি পাস করার পরই আমি তার জীবনবৃত্তান্ত এবং কিভাবে তাকে পেয়েছি একে একে সব বলেছি। আমি এবং জয়ন্তী দুজনেই ভয়ে ভয়ে ছিলাম সব জানার পর তার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়।

কাকিমা এবং জয়ন্তী দুজনেই আমাকে নিষেধ করেছিলেন বলার দরকার নেই। আমি তাদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই সব ঘটনা একটু একটু করে তাকে জানিয়েছি। সব শুনে জয়ন্ত শুধু বললো, কাকাবাবু এ গল্প আমাকে না শোনালেই বরং ভালো করতেন। কোন শিখ পরিবারে আমার জন্ম, কে আমার সত্যিকারের বাবা মা যখন কিছুই জানি না, উপরন্তু তাদের ফিরে পাওয়াও যখন কোনো সম্ভাবনা নেই তখন এ পরিচয়ের কি কোনো দরকার আছে?

জয়ন্তীকে দেখিয়ে বললো এ আমার মা, এ আমার দিদা আর তুমিই আমার বাবা। এ পরিচয়েই আমি বাচতে চাই।

কাকিমা তাকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, এমনই উত্তর আমি তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম দাদুভাই। তোমাকে নিয়েই আমরা দুই বিধবা নতুন করে বাচতে চাই। তুমিই আমাদের সব চাওয়া পাওয়া।

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে

বেলুন

মহসীন রেজা

এটাকে ঠিক আকাশ ভ্রমণ বলা যায় কি না বুঝতে পারছি না। ভ্রমণ মানে যদি হয় অভিজ্ঞতা, আনন্দ এবং জ্ঞান সঞ্চয় সেক্ষেত্রে আমার শৈশবকালীন উড়তে চাওয়ার অভিজ্ঞতাটা ভ্রমণ নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবি করতে পারে।

তখন ক্লাস থৃ কি ফোরে পড়ি। ছোটবেলা থেকেই আমি হালকা-পাতলা গড়নের। খুব ছটফট করি। মাথা দুষ্টবুদ্ধির আধার। আমার সব ধরনের দুষ্টবুদ্ধিতে সাকিব অবধারিত সঙ্গী।

আমাদের স্কুলের পাশে এক লোক বেলুন বিক্রি করতো। গ্যাস বেলুন। মাঝে মধ্যে আমি এবং সাকিব টিফিনের টাকা বাচিয়ে বেলুন কিনতাম দুষ্টুমির কাজে লাগাতাম।

গ্যাস বেলুনের সুতার সঙ্গে ছোট সাইজের ব্যাঙ বেধে দিয়ে দেখতাম সেটা দিব্যি উড়ে বেড়াচ্ছে। ব্যাঙের জ্বালা-যন্ত্রণা বোঝার মতো বয়স তখন ছিল না।

এই করতে করতে সাকিবের মাথায় এক সময় একটা মোক্ষম বুদ্ধি খেলে যায়। ব্যাঙ যদি উড়তে পারে তাহলে আমরা পারবো না কেন? ব্যাঙের একটা বেলুন লাগলে আমাদের না হয় আরো বেশি লাগবে। উড়তে তো পারবো। কিন্তু সমস্যা হলো এতো বেলুন কিভাবে জোগাড় করা হবে এবং বেলুন কেনার টাকাই বা আসবে কোথেকে।

উপায় বাতলে দিয়েছিলাম এবং এর সার্থক প্রয়োগে টাকাও হাতে এসে যায়। এখন শুধু মিশন শুরুর অপেক্ষা। কিন্তু মিশন শুরু করতে গিয়ে বাধলো ঝামেলা।

বেলুনওয়ালা এতো বেলুন এক সঙ্গে দিতে চাইলো না।

অনেক জোরাজুরি, অনুরোধের পর বেলুনওয়ালা ঢেকি গিলতে রাজি হয়। অনেক বেলুন। প্রায় পঞ্চাশ ষাটটি।

সব বেলুন আমার পিঠে বেধে ফেললাম। কারণ ওড়ার জন্য আমিই ছিলাম উপযুক্ত। সাকিব আমার চেয়ে অনেক মোটা।

পিঠে বেধে ফেলার পর শুরু হলো খেল। উপরের দিকে কেমন যেন শুধু একটা টান অনুভব করি। ওড়া আর হয় না। সেই ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য উপরের দিকে লম্ফঝম্পও শুরু করি।

একবার শুধু মনে হয়েছিল লাফ দিয়ে যতোটুকু উচুতে ওঠার কথা তারচেয়ে বেশি উঠে গেছি। আমার তখন সে কি উত্তেজনা!

কল্যাণপুর, ঢাকা থেকে
mohsinreza2005@yahoo.com

লাস্ট ফ্লাইট

মাহবুব-উর-রহমান চৌধুরী

একাত্তরের নভেম্বরের শেষ ভাগ ফেনী শহর মুক্তিবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে। শহরের আশপাশে চলছে খণ্ডযুদ্ধ। বাতাসে শীতের আমেজের সঙ্গে বারুদের গন্ধ। আতংকিত শহরবাসী আসন্ন ঘটনার কথা ভেবে যে যার মতো করে দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা তখন শহরের এক প্রান্তে ডাক্তারপাড়ায় নানাবাড়িতে অবস্থান করছিলাম। অবশ্য এখানে আসার আগে মা-বাবা ভাইবোনসহ আমাদের পরিবার বেশ কয়েক মাস গ্রামগঞ্জে যাযাবরের জীবন কাটাতে হয়েছিল।

নানা-নানি, মামা-খালাদের সঙ্গে মোটামুটি ভালোই কাটছিল দিনকাল। কিন্তু নভেম্বরের শেষে এসে মনে হলো শহরের পরিস্থিতি যেন দ্রুত খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এই শংকার মধ্যেই একদিন হঠাৎ করে দুমদুম রকেট আক্রমণ শুরু হলো। টার্গেট ফেনীর কেন্দ্রস্থল রাজাজির দীঘিরপাড়ের সার্কিট হাউস এলাকা যেখানে খান সেনাদের ঘাটি। লোকজন বলাবলি করছিল, মেজর জিয়ার নির্দেশে জাফর ইমামের মুক্তিবাহিনী এ আক্রমণ চালাচ্ছে, সহসাই তারা শহরে ঢুকবে।

আমার বাবা এই রকেট বৃষ্টির মধ্যেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ফিরে এসে মাকে ডেকে বললেন, তোমরা রেডি হয়ে নাও, আমরা আজই ঢাকা রওনা হবো। আম্মার অবস্থা ভালো নয়।

তার এ কথা শুনে সবাই তো হতবাক। বলে কি! এ দুর্যোগের মধ্যে কেউ রাস্তায় নামে নাকি। তাও যেতে হবে সুদূর ঢাকায়। এখানে বলে রাখি, আমার দাদি গলায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় আমার ছোট চাচার বাসায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে টেলিগ্রাম আসে। দাদা সেটা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের অবস্থার কথা ভেবে তিনি তার ছেলেকে ঢাকায় আসতে বলেননি, খবরটা জানিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু মা অন্তঃপ্রাণ আমার বাবা কেদে-কেটে অস্থির হয়ে আমার মাকে বললেন, পথে যতো বাধাই আসুক, যতো অসুবিধাই হোক আমরা ঢাকা যাবোই।

তখনকার দিনে ঢাকা যাবার পথ তো এখনকার মতো এতো মসৃণ ও ভালো ছিল না। বন্ধুর এই পথ যুদ্ধ অবস্থায় যে আরো বিপজ্জনক ও ঝুকিপূর্ণ থাকবে সে কথা একটি অবোধ শিশুও হয়তো বুঝবে। কিন্তু বুঝতে চাননি শুধু বাবা। তার অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল মাতৃভক্তিতে তিনি বিদ্যাসাগরকেও হার মানাবেন।

অবশেষে নানা–নানি, মামা–খালাদের কাদিয়ে আমরা সেদিন দুপুর বেলায় একটি রিজার্ভ করা বাসে গিয়ে উঠলাম। বাসে উঠে দেখি ভেতরে মেজো চাচার ফ্যামিলি। এতো দুঃখের মাঝেও মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়া কোনো শিশুর মতো আনন্দে মনটা নেচে উঠলো। কারণ তখন একটা সময় গেছে যখন হঠাৎ আপনজনদের কাছে দেখতে পেলে এক অনির্বচনীয় সুখে মনটা ভরে যেতো।

বাস যাত্রা শুরু করলো। চলন্ত বাসে বসেই বাবা ঢাকা যাবার প্ল্যানটা আমাদের কাছে খোলাসা করলেন। তিনি বললেন, এখন আমরা বাসে কুমিল্লা যাবো, সেখানে কিছুদিন থেকে প্লেনে সোজা ঢাকা। তখনকার সময়ে, কুমিল্লা–ঢাকা রুটে PIA–এর STOL নামে একটি সার্ভিস চালু ছিল। STOL কথাটার মানে হলো SHORT TAKING OFF AND LANDING. এই এয়ার সার্ভিসটা খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আঠারো সিটের দুটি প্লেনে এই STOL সার্ভিসটি চলতো। ঢাকা যাবার এ পরিকল্পনার কথা শুনে আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না, জীবনে প্রথমবারের মতো আকাশে উড়তে যাচ্ছি। মনে মনে ভাবছিলাম, কখন আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যখন মেঘের রাজ্যে বিচরণ করার সুযোগ পাবো।

আকাবাকা অমসৃণ পথে আমাদের বাস চললো কুমিল্লার পথে। বাসের ভেতর আমরা ছোট ভাইবোনরা হাসিঠাট্টায়, ম্যারাথন আড্ডায় মেতে উঠলাম। তবে এতো আড্ডার মাঝেও ভাইবোনদের মধ্যে সবার বড় হিসেবে একটা ব্যাপার আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। বাবা–মায়ের চোখে–মুখে এক ধরনের উদ্বেগের ছাপ সারা পথেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম। কারণ এই বাস জার্নিটা খুবই ঝুকিপূর্ণ ছিল। যখন বাস ফেনী ছেড়ে যাচ্ছিল তখন বাসের ওপর দিয়ে শো শো করে কামানের গোলা উড়ে যাচ্ছিল। বাসের জানালা দিয়ে এ রকম দুই একটি গোলা ধান ক্ষেতের ওপর ক্র্যাশ করতে দেখেছি। মাঝে মাঝে বিকট শব্দে আমরা কেপে উঠতাম। আমাদের কথাবার্তা, হাসাহাসি থমকে যেতো কিছুক্ষণের জন্য। পরে আবার শুরু হতো। বাবা ধমকের সুরে বলতেন, খোদাকে ডাকো, হই চই বন্ধ করো।

কিন্তু শিশুকাল বলে কথা, বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকার সময় যে সেটা নয়।

পথে পথে আর্মির চেকপোস্ট, রাজাকার, মিলিশিয়াদের ভীতিময় চেকিংসহ সব বাধা–বিপদ পার হয়ে অবশেষে কুমিল্লা শহরের ঐতিহ্যবাহী মুন্সেফ বাড়িতে এসে আমরা উপস্থিত হলাম। একটি মজার ব্যাপার হলো, এই বাসযাত্রায় আমার এক মুক্তিযোদ্ধা মামাও শরিক হয়েছিলেন। তিনি ইনডিয়ার মেঘালয়ে ট্রেনিং নিয়ে ফেনীর কাছে একটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। পরে হাই কমান্ডের কোনো বার্তা নিয়ে কিংবা কোনো গেরিলা অপারেশনে অংশ নিতে তার ঢাকা যাবার কথা ছিল। ফেনীতেই তিনি এই পরিকল্পনার কথা বাবাকে জানিয়েছিলেন। বাবা তা জেনে রিস্ক নিয়ে তার মুক্তিযোদ্ধা শ্যালককে সঙ্গে করে কুমিল্লায় এসেছিলেন এবং ঢাকায়ও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন বলে তাকে কথা দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশমাতৃকার টানে মুক্তিযোদ্ধাদের এমনিভাবে ছোট ছোট সাহায্য করতে সবাই এগিয়ে আসতো।

আমরা মুন্সেফ বাড়িতে যে বাসায় উঠেছিলাম সেটি ওই মুক্তিযোদ্ধা মামার বাসা ছিল। তার বাবা-মা অর্থাৎ আমার নানা-নানি হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে কাছে পেয়ে খুশিতে জড়িয়ে ধরলেন এবং বাবাকে দোয়ার সাগরে ভাসিয়ে দিতে লাগলেন।

কুমিল্লায় দুদিনের বেশি থাকা সম্ভব হলো না দাদির ক্রমেই খারাপ হওয়া শারীরিক অবস্থার কারণে। এ দুদিনে বাবা রাতের খাবার টেবিলে নানান বিষয়ে আমাদের বৃফ করতেন। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন, একটি জটিল পরিস্থিতিতে আমরা প্লেনে চড়তে যাচ্ছি। তাই এয়ারপোর্টে পৌছানোর পর অহেতুক কোনো কথা বলা চলবে না। সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, কেউ কিছু খেতে দিলে খাওয়া চলবে না। মুক্তিযোদ্ধা মামা প্লেনে বাবার পাশের সিটে বসবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে বুঝেছিলাম এসব বৃফিং আমাদের কতো কাজে লেগেছিল!

যেদিন আমাদের ফ্লাইট ছিল সেদিন মামা বেলা এগারোটার দিকে শহর ঘুরে এসে জানালেন, দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তায় যানবাহন তেমন নেই, সারা শহরে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। নানা-নানির নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই চারটা বেবিট্যাকসিতে গাদাগাদি করে বসে যখন রাস্তায় নামলাম, তখন এমন প্রাণচঞ্চল শহরের মরা চেহারা দেখে সত্যিই ভয়ে আতকে উঠেছিলাম। শহর থেকে একটু দূরে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যেতে যেতে পথ জুড়ে কেবল আর্মি জিপের ছোটাছুটি আর লেজওয়ালা ওই ছোট প্রাণীটির অবাধ বিচরণ ছাড়া তেমন কিছুই চোখে পড়েনি। এয়ারপোর্টে পৌছামাত্র পুরুষদের দেহ তল্লাশি করা হলো। গৃন সিগনাল পেয়ে মালপত্তরসহ আমরা এগোতে লাগলাম টার্মিনাল ভবনের দিকে। যেতে যেতে দেখলাম একটি ছোট বিমান দাড়িয়ে আছে।

খুশি মনে বাবাকে বললাম, বাবা, এই কি আমাদের সেই প্লেন?

বাবা চোখ কটমট করে বললেন, খোদাকে ডাকো।

টার্মিনাল ভবনে ঢোকার মুখে মালামাল চেক করে প্লেনে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরা সবাই ভেতরে ঢুকে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসলাম। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। বিকাল তিনটায় প্লেন ছাড়ার কথা থাকলেও ততোক্ষণে চারটা বেজে গেছে অথচ প্লেন ওড়ার কোনো নামগন্ধ নেই। বাবা ও চাচাকে দেখলাম একটি রুমে ঘন ঘন যাতায়াত করছেন, মনে হলো সেই রুমে হয়তো কোনো হোমড়া-চোমড়া বসে আছে।

এক সময় বাবা মুখ কালো করে এসে মাকে বললেন, প্লেন ওড়ে কি না সন্দেহ আছে।

এ কথা শুনে মায়ের চোখে পানি চলে এলো। তিনি দুই হাত দিয়ে পানি মুছছিলেন। ঠিক তখনই মায়ের পাশে বসা মধ্যবয়সী এক পাঞ্জাবি মহিলা মাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে অভয় দিয়ে বললেন, আপা ঘাবড়াবেন না, প্লেন অবশ্যই উড়বে। আমিও আপনাদের সঙ্গে ঢাকা যাবো।

আমরা ওয়েটিং রুমে বসে আছি আর ক্ষণ গণনা করছি প্লেন ওড়ার।

হঠাৎ এক আর্মি অফিসার মাতাল অবস্থায় সেখানে ঢুকে হই চই শুরু করলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, কিভাবে প্লেন উড়বে, শালা মুক্তিযোদ্ধারা যে গোলা ফেলছে!

এসব দেখে বাবা মুক্তিযোদ্ধা মামার সেন্টিমেন্ট বুঝতে পেরে তার পাশে এসে দাড়ালেন এবং তাকে শান্ত থাকার জন্য বললেন। কারণ বলা তো যায় না এসব কথায় যদি মামা উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা করে বসেন। ওনার রক্তে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন টগবগ করছে।

যে যাক, সব ঘটনা–রটনার অবসান ঘটিয়ে একজন আর্মি অফিসার এসে অনেকটা ধমকে সুরে আমাদের প্লেন উঠতে বললো। আমরাও হাপ ছেড়ে বাচলাম এবং একে একে ছোট একটি সিড়ি বেয়ে প্লেনে ঢুকলাম। ভেতরে বেশ ছিমছাম পরিবেশ এবং এয়ার কন্ডিশন সিসটেমও কাজ করছে দেখে বেশ আরাম অনুভূত হলো। মনে হলো নরক থেকে যেন স্বর্গে প্রবেশ করলাম।

এক এক করে আমরা সবাই সিটে বসে পড়লাম। আমার পাশের সিটে বসলেন ওই পাঞ্জাবি মহিলা। এতে আমার বেশ লজ্জা লাগছিল। তখনকার সময়ে এ রকম লজ্জা লাগা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। যদিও এখনকার অবাধ মেলামেশার যুগে এ ধরনের লজ্জার কথা শুনে আমার ছোট মেয়েও হাসবে। মাথার ওপর সাউন্ড সিসটেমে পাইলটের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, সিটবেল্ট বাধুন, একটু পরে ঢাকার পথে আমরা যাত্রা করবো।

পাশে বসা ওই মহিলা প্রথমে নিজের সিটবেল্ট বাধলেন। পরে মায়ের মমতায় আমার বেল্টাও বেধে দিলেন। লজ্জায় যেন আমি নুয়ে পড়লাম।

প্রথমে ডানপাশের প্রপেলার ঘোরা শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর বাম দিকের প্রপেলারও ঘুরতে লাগলো। এমনি করে প্রায় পাচ মিনিট কাটানোর পর রানওয়েতে ছোট্ট একটা দৌড় দিয়ে প্লেনটা আকাশে উঠে গেল। আমিও স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে গেলাম। একবার ডান দিকের পাশের জানালা, আবার বাম দিকের একটু দূরের জানালা দিয়ে উকিঝুকি মারছিলাম। আমার অবস্থা দেখে ওই মহিলা হেসে বললেন, এটা বোধহয় তোমার প্রথম আকাশ ভ্রমণ, তাই না?

আমিও মুচকি হেসে মাথা নেড়ে তার অনুমান সমর্থন করলাম। এরপর অনেক্ষণ ধরে তিনি আর কোনো কথা বলেননি। তাকে দেখে মনে হলো, হঠাৎ যেন কোনো ভাবনার সাগরে তিনি ডুব দিয়েছেন।

আমিও নিজের একান্ত ভাবনার রাজ্যে ফিরে এলাম এবং চুপচাপ ডান দিকের গোল জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে রইলাম। নদ–নদীর এই দেশে নদীগুলো মনে হলো বোনের নীল রঙের চুলের ফিতার মতো একেবেকে সবুজ জমিন, হলুদ জমিনে কি সুন্দর পরে আছে! যেন সুনিপুণ হাতে বোনা বিশাল এক নকশী কাথার ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি। আশপাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে শাদা তুলার মতো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘরাশি।

সত্যিই অকল্পনীয়! ত্রিশ পয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা ঢাকার কাছে পৌছে গেলাম। সাউন্ড সিসটেমে পাইলটের ঘোষণা ভেসে এলো, সম্মানিত যাত্রীরা, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ঢাকায় অবতরণ করতে যাচ্ছি।

ঠিক তখনই আমার পাশের সেই অবাঙালি মহিলা আবার মুখ খুললেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

আমি উত্তর দিলাম।

তারপর অনেকটা কাদো কাদো স্বরে বললেন, তোমরা খুব সহসাই স্বাধীন হয়ে যাবে। একটু পরে তোমরা যার যার ঘরে ফিরে যাবে, সহসাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে মেতে উঠবে। আর আমি, একজন মেজরের স্ত্রী হয়ে সেই যে এখানে এলাম, এখনো জানি না আমার স্বামী কোথায় আছেন? কেমন আছেন? কোথায় যুদ্ধ করছেন! কিছুই জানি না! দেশে তোমার মতো আমারও স্কুল পড়ুয়া একটি ছেলে আছে। আমি কি দেশে ফিরে যেতে পারবো? ছেলেটির মুখ দেখতে পারবো?

এ কথা বলেই তিনি দুহাতে মুখ ঢেকে ঝরঝর করে কেদে ফেললেন।

আমিও ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে একটু একটু করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে আপনার সঠিক উপলব্ধির জন্য ধন্যবাদ। আশা করি আপনি আপনার দেশে ফিরে যেতে পারবেন এবং আপনার প্রিয়জনের মধুর সান্নিধ্য আবার ফিরে পাবেন।

এ কথা বলার সময় আমার দুচোখও ভিজে এলো। কারণ আমিও মানুষ, আমারও আবেগ আছে। সন্তান বৎসল প্রতিটি মায়ের মতো এই *মা*–এর ভেতরের বেদনাটা কতো গভীর হতে পারে সেটা দশম ক্লাসে পড়া কোনো কিশোরের পক্ষে বোঝা খুব কঠিন নয়। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয়, এই মায়েদের আর্তনাদের ভাষা শুধু বোঝেন না গদিপ্রিয় কিছু উচ্চাভিলাষী সুচতুর রাজনীতিবিদ। যারা ক্ষমতার লোভে বন্দুক দিয়ে মেজোরিটির রায়কে অস্বীকার করেন।

ইতিমধ্যেই আমাদের প্লেন রানওয়েতে এসে দাড়িয়েছে। বেল্ট খুলতে খুলতে মহিলাটি বললেন, তোমার মাকে আমার সালাম দিও, আমার জন্য দোয়া করতে বলো।

আমরা একে একে নেমে গেলাম ঢাকার পুরনো তেজগাও এয়ারপোর্টে। দেখলাম বিশাল এক বাস রানওয়েতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই বয়সে এতো চওড়া বড় মাপের বাস আগে কখনো দেখিনি। বাসটি দেখতে দেখতে সবার সঙ্গে ভেতরে গিয়ে বসলাম। এই বাসে চড়ে টার্মিনাল ভবনে হাজির হলাম। দেখলাম, ওই পাঞ্জাবি মহিলা কয়েকজন আর্মি অফিসারের সঙ্গে হেটে একটি রুমে গিয়ে ঢুকছেন। আমাকে দেখে দূর থেকে হাত ওঠালেন।

এদিকে আমাদের রিসিভ করতে আমার বৃদ্ধ দাদা এসেছিলেন। বাবাকে জড়িয়ে ধরে তিনি কিছুক্ষণ কাদলেন। তারপর দুটো টয়োটা গাড়িতে চড়ে মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় আমার চাচার বাসায় এলাম। অসুস্থ দাদি আমাদের সবাইকে দেখে খুব খুশি হলেন। গলার ক্যান্সারের ব্যথার কারণে কথা বলতে না পারলেও তার চোখেমুখে খুশির আভাস ফুটে উঠেছিল। তার ওই আনন্দে আমাদের সব ধকল যেন মুহূর্তেই কোথায় হারিয়ে গেল।

রাতে খাবার শেষে টেবিলে বসেই আমার দাদা সব ঝুকি মাথায় নিয়ে আমাদের নিরাপদে ঢাকায় আসতে সৃষ্টিকর্তার দরবারে শোকরানা মোনাজাত করালেন। খাবার টেবিল ছেড়ে ওঠার মুহূর্তেই শুরু হলো বিমান আক্রমণ। বিবিসি রাতের খবরে জানালো, একটু আগে ইনডিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে মিত্রবাহিনীরূপে যুদ্ধে অংশ নিতে ইনডিয়ান বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন। যার ফলে রাতেই শুরু হয়েছিল মুহুর্মুহু বিমান আক্রমণ। আমার মুক্তিযোদ্ধা মামা খাবার শেষে রাতেই চলে গেলেন।

সে রাতে বিবিসি আরেক খবর জানালো, কুমিল্লা থেকে ঢাকাগামী STOL বিমান ফ্লাইটটি মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়েছিল এবং ওই ফ্লাইট ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সিভিল এভিয়েশনের সর্বশেষ বা লাস্ট ফ্লাইট। ওই লাস্ট ফ্লাইটটি কোনটি ছিল আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না। সেই ফ্লাইটটির কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

ঢাকায় আসার কিছুদিন পর স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় এলো। খুশিতে, আনন্দে ভাসছে সারা দেশ। বিজয়ের কিছুদিনের মধ্যেই আমরা হারালাম দাদিকে। একদিকে আনন্দ আরেকদিকে প্রিয়জন হারানোর বেদনা। কিন্তু এই তো জীবন।

পল্লবী, ঢাকা থেকে

দুঃস্বপ্ন

আলেক আহমদ খান

জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটে। শৈশব থেকে বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অনেক ঘটনাই বা স্মৃতি সব সময় মনে থাকে না। কিন্তু এমন এক একটি ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটে যা শত চেষ্টা করেও কোনোদিন ভুলতে পারে না। একটি স্মৃতি চিরদিনের জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে।

আমরা আমেরিকা যাচ্ছিলাম।

আমাদের ফ্লাইট ছিল রাত নয়টায়। টাইম মতো এয়ারপোর্টে পৌছেছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক ভদ্রলোক। তার ছিল এক সুন্দরী কন্যা। সে দেখতে ছিল বেশ। বিমানটি যখন ছাড়লো তখন মেয়েটি আমার অন্যদিকে বসা ছিল। কল্পনা করেছিলাম যদি মেয়েটি আমার সিটের পাশে বসতো! কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, তার বাবার কাছে জানতে পারলাম সে ছিল বিবাহিত। প্রথম ধাক্কায় খুব কষ্ট পেলাম। আমার মনে হয় বিমানে চড়াটা ছিল আমার জন্য অভিজ্ঞতার দুঃস্বপ্ন।

সিলেট থেকে

সহযাত্রী

১৯৯৮ সাল। যাবো কলকাতা-মুম্বাই। ঢাকা এয়ারপোর্ট পৌছে প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে দেখি আমার চেনা চমৎকার এক যুবতী, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। শাদা কাপড়ের স্কিনটাইট প্যান্টের ওপর হাল্কা গোলাপি রঙয়ের স্লিভলেস টাইট গেঞ্জি পরা, দুটো বোতামই খোলা। উন্নত বুক দৃষ্টি কেড়ে নেয় প্রথম দেখাতেই। কপালে সানগ্লাস, পায়ে পেন্সিল হিল স্যান্ডাল শু। তার ডাগর চোখ যেন না বলা সব কথা বলে দেয় প্রথম দর্শনেই। ফোলা ফোলা দুই গালে সামান্য হাসলেই টোল পড়ে। সামান্য মোটা ঠোট আবেদনময়ী। বাড়তি কিছু প্রসাধনী সৌন্দর্যকে কিছুটা উৎকট করেছে কিন্তু আকর্ষণ বেড়েছে হাজার গুণ।

তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। মনে করতে পারছি না কে সে, কেন তাকে এতো আপন মনে হয়। বার বার স্মৃতির পাতা রিওয়াইন্ড করছি, হদিস করতে পারছি না। তাকে ইশারায় হ্যালো বলতেই সে হেসে প্রতিউত্তর দিল।

সব বয়সের যাত্রীর নজর তার দিকে। আমিও নানান সুযোগে তাকে দেখতে লাগলাম। কথা বলার সুযোগ খুজতে লাগলাম। তাকে চিনতে না পারলেও আমাকে হয়তো চিনবে সে আশায় তার দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যর্থ চেষ্টা করছি।

স্লিভলেস গেঞ্জি ঠেলে তার উদ্ধত বুকের নিপল উকি দিচ্ছে যা সহজেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। শাদা প্যান্টের নিচে আকর্ষণীয় হিপের উপর প্যান্টির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আমি চোখ ফেরাতে পারি না।

চোখের দৃষ্টিতে তার বাহ্যিক সৌন্দর্য দেখছি আর মনের এক্সরে দিয়ে শরীরের আবৃত লোভনীয় অংশ নিয়ে গবেষণা করছি। সবাই তার শরীরের অনাবৃত বিশেষ জায়গাগুলো দেখছে হা করে। আমার খুব রাগ হচ্ছে। মনে হয়, তার সব কিছু একমাত্র আমিই দেখবো, অন্যদের তাকানোও অন্যায়।

তার প্রতি আমার রাগও হচ্ছে এই শীতের মধ্যেও কেন সে স্লিভলেস গেঞ্জি পরেছে। যদি সোয়েটার পরতো তবে হয়তো সবাই এমন করে তাকাতো না। তাকে আকর্ষণীয় লাগে বুঝেই এই আটসাট ড্রেস পরেছে।

বিমান যথানিয়মে এক ঘণ্টা লেট। আমার খারাপ লাগছে না। মনে মনে খুশি হলাম, এ সুন্দরীকে আরো কিছু সময় কাছ থেকে দেখতে পাবো সেই আশায়। জানি না কোন দেশে উড়াল দেবে এই ললনা। কারণ আমার যাত্রার সময়ের কাছাকাছি আরো দুটো প্লেন দাড়িয়ে আছে – থাই ও সউদি এয়ারলাইন্সের।

যখন বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহের ঘোষণা এলো লক্ষ্য করলাম সেও হাতের ব্যাগটা নিয়ে বিমানের কাউন্টারের দিকে যাচ্ছে। তার পাশাপাশি দাড়াতে চেষ্টা করে ফেল মারলাম। আমি হলাম আজন্মের পোড়া কপাইল্লা। তার থেকে দশ বারোজন পেছনে। তার শরীরের ঘ্রাণ নেয়া হলো না।

বিমানে ওঠার সময়ও তার কাছাকাছি হতে পারলাম না। আমার থেকে সে প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন পেছনে। হতাশ মনে বিমানে আমার আসনের সামনে ব্যাগ হাতে দাড়িয়ে আছি। তাকে আবারও কাছ থেকে দেখার সুযোগ হবে যদি তার আসন আমার পেছনে হয় তবে আমাকে ক্রস করে তাকে যেতে হবে। রেডি হয়ে আছি যখন সে আমাকে ক্রস করবে তখন উপরে লাগেজ বক্সে লাগেজ রাখার ভান করে তার শরীরের স্পর্শ নেবো। কিন্তু এক *কেহেরমান* টাইপের লোক আমার ব্যাগ নিয়ে দাড়িয়ে থাকায় বিরক্ত হয়ে প্যাসেজ ছেড়ে সিটে বসতে বললেন। ওই যাত্রী হয়তো ভেবেছেন তার স্ত্রীকে দেখার জন্য সেখানে দাড়িয়ে আছি। বসে আছি, তার দেখা নেই। হয়তো সামনে বসেছে অথবা এক্সিকিউটিভ ক্লাসের যাত্রী। হতাশায় আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে।

এমন সময় সে এলো এয়ারহস্টেসের সঙ্গে হাসতে হাসতে। একদম সামনে, আমার পাশে দাড়িয়ে দুহাত তুলে লাগেজ বক্সে তার লাগেজ রাখছেন। তার সুন্দর মসৃণ শেভ করা দুবগল বাহু দেখতে পাচ্ছি। দুহাত উপরে তোলায় তার প্যান্ট ও গেঞ্জির মাঝখান থেকে তার অপূর্ব সুন্দর নাভি–পেট দেখে আমি উত্তেজনায় সপ্তমে পৌছে গেছি। জানি না সে কোন সিটে বসবে। আমার কাছাকাছি বেশ কয়েকটা সিট এখনো ফাকা। আমাকে হতবাক করে আমার পাশের সিটেই বসলো এয়ারহস্টেসের সহায়তা ছাড়াই। উত্তেজনা আর আবেগে কাপছি, ঘেমে যাচ্ছি। সে খুব সুন্দর করে ইংরেজিতে অনুরোধ করলো জানালার পাশের সিট বদল করার। এক বাক্যে রাজি হলাম।

সিট ছেড়ে দেয়া তো সামান্য ব্যাপার। ক্ষমতা থাকলে বিমানের সব যাত্রী নামিয়ে দিয়ে সারা জীবন তোমায় নিয়ে আকাশে ভাসতাম। সাধ্য থাকলে পুরো বিমানটি তোমায় দিয়ে দিতাম, সঙ্গে বলাকা ভবন বোনাস!

বসে আছি তার পাশে, যাকে আমি দুঘণ্টা ধরে কামনা করছিলাম। আমার দিকে অনেক যাত্রী হিংসুটে দৃষ্টি দিচ্ছে তা অনুভব করছি। তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খুজছি। সে তার ব্যাগ থেকে *সিটি অফ জয়* বের করে মনোযোগ সহকারে পড়ছে। ভাবখানা এমন, কাল যেন তার এসএসসি পরীক্ষা শুরু হবে। পাশে আমার উপস্থিতি সে ভুলেই গেল অথচ তাকে খুশি করতে আমার সিট ছেড়ে দিয়ে কি আত্মত্যাগটাই না স্বীকার করলাম! সুন্দরী মেয়েরা একটু অকৃতজ্ঞ হয় মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম।

এয়ারহস্টেস হালকা নাশতা দিয়ে তাকে বিশেষ খাতির করলেন সে কিছুই নিল না। নিজ ব্যাগ থেকে চুয়িং গাম বের করে খুব কসরৎ করে চুষতে লাগলো। তখন নিজেকে চুয়িং গাম ভাবতে ভালো লাগছিল। আশপাশের যাত্রীরা তাকে দেখার জন্য বিভিন্ন রকমের কসরৎ করছেন তা টের পেয়ে যতোটা সম্ভব তাকে আড়াল করে রাখি শুধু একা দেখবো বলে।

এবার এয়ারহস্টেস এমবারকেশন ফরম পূরণ করার জন্য সবার সামনে সরবরাহ করলেন। আমি ওৎ পেতে আছি ফরম পূরণ করার সময় তার পরিচয় জানার জন্য। সে তার কোমরের বেল্ট থেকে ইনডিয়ান পাসপোর্ট বের করলো। সুযোগ পেয়ে বললাম, ইনডিয়ান সিটিজেনদের ওই ফরম পূরণ করার প্রয়োজন নেই।

সে ভ্রূ নাচিয়ে গালে টোল ফেলে শুধু হাসলো, আমার বুকের মধ্যে ঢেউ খেলে গেল। সে পাসপোর্ট খুলে ফরম পূরণ করতে লাগলো। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তার দিকে ঝুকে পড়ে দেখলাম নাম লেখা Satabdi Roy, Actress.

চিৎকার করে বলে উঠলাম, আপনি শতাব্দী রায়? (বর্তমানে প্রচারিত ক্লিয়ার শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনের মতো, তুমিই শাহেদ? টাইপের)।

অবচেতন মনেই শতাব্দীর হাত ধরে কথা বলছি। তিনি একটু অপ্রস্তুত হলেন এবং বেশ জোরে হাসলেন।

হ্যা, এই তো শতাব্দী রায়, হাসলেই গালে টোল পড়ে, সামান্য দাতের মাঢ়ি বের হয়। আমার উচুস্বরের কথা শুনে এবং উৎফুল্লতা দেখে শতাব্দী সামান্য বিব্রত হলেও বিরক্ত হননি। পাশাপাশি সিটের যাত্রীরা আমাদের দেখছেন।

এক নিঃশ্বাসে বললাম, জানেন, আপনাকে নিয়ে কল্পনায় কতো কি করেছি, কতো কি ভেবেছি...।

আমার স্বপ্নের শতাব্দী রায় নাটোরের বনলতা সেনের মতো ডাগর চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে নিয়ে আপনি কল্পনায় কি ভেবেছেন, কি করেছেন?

লজ্জিত হয়ে আমতা আমতা করে বললাম -*ইয়ে, মানে না - এই সব আর কি*। আপনার অভিনীত প্রায় সব মুভিই আমি দেখেছি এবং অনেক মুভি আমার সংগ্রহে আছে।

শতাব্দী জানতে চাইলেন, তার অভিনীত কি কি মুভি দেখেছি, কোন ছবি বেশি ভালো লেগেছে ইত্যাদি।

বললাম, আপনার অভিনীত সব মুভিই আমি দেখেছি, যেমন ওই যে কি যেন মুভিটা- ওই যে আপনি ... একটা মুভির নামও মনে করতে পারলাম না!

অথচ শতাব্দীর অনেক ছবি মুভি কম্পোজ করে কমপিউটারে সংরক্ষণ করে রেখেছি। তা নিয়ে আমার বৌ কতো খোচা মেরেছে। সংসারে অশান্তি পর্যন্ত দেখা দিয়েছিল অথচ আজ আমার স্বপ্নের নায়িকাকে তার অভিনীত একটা মুভির নাম পর্যন্ত বলতে পারছি না! আমার কল্পনায়, রক্তে, ঘামে, স্বপ্নে মিশে আছে শতাব্দী রায় অথচ আজ তার সামনে আমার সব স্বপ্ন, সব স্মৃতি বিস্মৃত হলো, এ লজ্জা আমায় কেন দিলেন বিধাতা?

শতাব্দী কিছুটা উদাস কণ্ঠে শুধালেন, আমার নাম দেখার আগে কি আপনি বুঝতেই পারেননি আমি শতাব্দী রায়?

বললাম, না, চিনতে পারিনি। তবে খুব পরিচিত, খুব আপন মনে হচ্ছিল।

আবার শতাব্দী কিছুটা খেদোক্তি করে বললেন, আমি আপনার এতো প্রিয় নায়িকা, আমার অভিনীত সব মুভি দেখেছেন, মুভির কালেকশন আছে অথচ আমার অভিনীত একটা মুভির নামও বলতে পারলেন না?

পাথর হয়ে গেলাম লজ্জায়–দুঃখে!

একটু ধাতস্থ হয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার অভিনীত একটা মুভির নাম বললাম, *পেন্নাম কলকাতা*। জানালাম ওই মুভি দেখার পরই মূলত আপনার ভক্ত হয়ে যাই ... আমার কল্পনার রাজ্যে আপনাকে নিয়ে একাকী বিচরণ। তারপর তার অভিনীত বিভিন্ন মুভি সম্পর্কে বলতে শুরু করি ... বলতে থাকি কলকাতার বিনোদন পত্রিকা তাকে নিয়ে বিভিন্ন লেখা প্রসঙ্গে ...

এবার দেবী বিশ্বাস করলেন, অনুভব করলেন আমি তার কতোটা ভক্ত।

কলকাতা পৌছার ঘোষণা দিল বিমান। আমি আমার পরিচয় দিলাম... একটা ভিজিটিং কার্ড তাকে দিলাম। তিনিও তার ভিজিটিং কার্ড দিলেন। শাদা রঙের একশ চল্লিশ গ্রাম গ্লসি পেপারে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা শতাব্দী রায়, তার সই পৃন্ট করা। নিচে দুইটি টেলিফোন নাম্বার, কোনো ঠিকানা নেই। কার্ডটা রেখে আমার নোট বুকটা বের করে তার হাতে দিল টিনএজ ভক্তের মতো।

আমার দিকে ভুবন ভোলানো হাসি দিয়ে একটু ভেবে লিখলেন ... আমার আজব ভক্ত (কিছুটা পাগলাটেও) যিনি আমাকে দেখেও চেনেননি। আমার অভিনীত একটা মুভির নামও বলতে পারেন না, সই শ্রদ্ধাস্পদ ... কে শতাব্দী রায়, তারিখ.... শেষে তার মোবাইল ফোন নাম্বার লিখে দিলেন।

আমিও মোবাইল নাম্বার দিলাম। শতাব্দী জানতে চাইলেন কলকাতায় কোথায় থাকবো এবং এয়ারপোর্টে আমার জন্য কোনো ট্রান্সপোর্ট থাকবে কি না।

হোটেলের নাম বললাম এবং জানালাম এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাকসিক্যাবে হোটেলে যাবো।

তিনি হেসে বললেন, আমার ড্রাইভার আমার জন্য অপেক্ষা করবে। যদি আপনাকে হোটেলে লিফট দিই ...।

এক বাক্যে রাজি হলাম...।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঢাকা থেকে
kabirh45@yahoo.com

এ- তে এরোপ্লেন

নাজু

আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগের কথা। বাংলাদেশের এক ছোট মফস্বল শহর ফেনীতে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। আব্বা আমাদের ভাইবোনদের জন্য সুন্দর সুন্দর রঙিন ছবিওয়ালা বই চট্টগ্রাম থেকে কিনে আনতেন। প্লেনের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই তখনই।

অ, আ, এ–তে এরোপ্লেন। আমাদের লজিং মাস্টার বোঝালেন, এটা প্লেন, আকাশে ওড়ে। পরম বিস্ময় আর অবাক চোখে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। বইটা সারা দিন বুকের মাঝে ধরে রাখতাম, বুকে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়তাম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই আম্মার কাছ থেকে বইটা

চেয়ে নিতাম। আব্বা-আম্মা, আপা, লজিং মাস্টার সবার কাছে গিয়ে পড়তে শেখানোর জন্য সারা দিন তাদের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতাম। ভাত খেতে বসেও খাওয়ার ফাকে ফাকে পড়তে থাকতাম।

আব্বা বিরক্ত হয়ে আম্মাকে বললেন, এই মেয়ের যন্ত্রণায় দুপুরে একটু ঘুমানোর উপায় নেই।

আমাদের এই ছোট শহরে বছরে দুই একবার প্লেন উড়ে যেতো আকাশে। প্লেনের শব্দ পেয়ে আমরা বাচ্চারা সব ঘর ছেড়ে মাঠে, উঠানে দাড়িয়ে খুশিতে চিৎকার দিয়ে উঠতাম। প্লেন দেখতে পেয়ে চারদিক থেকে শিশুদের কলরোল আর হাততালির আওয়াজ পেতাম। আমরা প্লেনের দিকে তাকিয়ে চালককে হাত নাড়তাম। শিশুকালে ভাবতাম, তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন, খুশি হচ্ছেন।

আমাদের বাসার পাশে ছিল রেল লাইন। রেল লাইনে খেলতে গিয়ে স্লিপারের ওপর মাঝে মাঝে মানুষের মল দেখতাম। তাই একটু বুদ্ধি হবার পর আর প্লেন দেখতে মাঠে যেতাম না। ভাবতাম প্লেনে চড়া মানুষ যখন বাথরুম করে তখন তা বাতাসে ভেসে আমাদের মাথায় পড়ে। এটা ছিল আমার ছোট বয়সের হাস্যকর কল্পনা।

১৯৭৪ সালে আমার বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। দুলাভাই রেডক্রসে চাকরি করেন। পোস্টিং যশোর। সপ্তাহে তিনদিন খুলনায় থাকতে হয়। তাই আমিও যাচ্ছি বোনের সঙ্গে আইকম পরীক্ষা দিয়ে। ঢাকা থেকে প্লেনে যশোর। অনেক দিনের স্বপ্ন বুকের ভেতর প্লেনে চড়ার। মনের ভেতর উত্তেজনা কাজ করছে। খুব খুশি। কিন্তু কাউকেই সেটা বুঝতে দিচ্ছি না। টিনএজ-এর প্রতিক্রিয়া।

আসলে আমাদের সময় হাসিকান্না, খুশি সব কিছুই যেন কেমন লুকিয়ে রাখার প্রবণতা ছিল। আমরা এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো এতো ফ্রি ছিলাম না। গুরুজনকে এতো ভয় পেতাম যে, নিজের খুশিটাও বুঝতে দিতাম না, বুকের ভেতর চাপা দিয়ে রাখতাম।

যে কথা বলছিলাম। সকাল নয়টায় এয়ারপোর্টে পৌছে গেলাম। আপার ননদের বাসা কাছেই। তাই দেরি হলো না। দুলাভাই টিকেট এবং আনুষঙ্গিক সব কিছু সারলেন। আমরা ভেতরে গিয়ে একটা রুমে বসলাম। চারদিক কাচ দিয়ে ঘেরা। সেখান থেকে প্লেন দেখা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর মাইকে অ্যানাউন্স হলো যাত্রীদের জন্য বাস রেডি। বাসে করে প্লেনের কাছে গেলাম। সিড়ি বেয়ে ভেতরে সিট নাম্বার অনুযায়ী বসলাম। আমি জানালার পাশে। আস্তে আস্তে ভয় আমাকে গ্রাস করে নিল। খুশিও লাগছে। সিটবেল্ট বেধে নিলাম। প্লেন চলতে শুরু করলো।

ভয়, উত্তেজনা ও আনন্দে বুকের ভেতর দুরু দুরু করছে। বোনের দিকে তাকালাম। তিনি নির্বিকার, স্বাভাবিক। সেও এই প্রথম প্লেনে চড়েছে আমার মতো। প্লেন দৌড়াতে শুরু করলো। ভয়ে আয়তুল কুরছি পড়া শুরু করলাম। কিছুক্ষণ চলার পরই সাই করে প্লেন আকাশে ওঠা শুরু করলো। ভয়ে সিটের হাতল শক্ত করে ধরলাম আর কলেমা পড়তে থাকলাম। কারণ ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

আসলে তা নয়, বুকের ভেতর কেমন অনুভূতি ঠিক বোঝানো সম্ভব নয়। সাহস করে জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকালাম। মাঠগুলোকে মনে হচ্ছিল সবুজ কার্পেট আর বিল্ডিংগুলোকে মনে হচ্ছিল খেলনা ঘর।

আস্তে আস্তে প্লেনটা মেঘের ভেতর ঢুকে গেল। কি চমৎকার। মনে হচ্ছিল শাদা ছোট ছোট পাহাড়। একটার পর একটা পাহাড় ভেঙে প্লেনটা এগিয়ে যাচ্ছে যেন। কখনো মনে হচ্ছিল তুলার

মতো। আবার কখনো মনে হচ্ছিল শাদা বরফ। প্লেনটা মাঝে মাঝে মেঘের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দুলে দুলে উঠছিল। আবার একটু পরেই অনেক নিচে নেমে এসে স্থির হয়ে আবার উপরে উঠতে শুরু করলো। খুব ভয়ে পেয়ে বোনের হাত ধরলাম। দুলাভাই হেসে বললেন, প্লেন বামপিং করছে।

ছোট ট্রেতে করে দুই পিস কেক ও ছোট এক গ্লাস সেভেন আপ সার্ভ করলো এয়ারহস্টেস। সেগুলো খাওয়ার একটু পরই যশোর এয়ারপোর্টে পৌছালাম।

আমার হাজব্যান্ড প্রায়ই দেশের বাইরে যান। আমারও মাঝে মাঝে যাওয়া হয়। কিন্তু টিনএজের সেই প্লেন জার্নির মতো এখন আর তেমন রোমাঞ্চ ও শ্বাসরুদ্ধকর মনে হয় না। সে রকম খুশি ও উত্তেজনা কাজ করে না মনের ভেতর।

আসলে বয়স। একেক বয়সের আনন্দই একেক রকম।

ধানমন্ডি থেকে

সাবরিনার জন্য প্রার্থনা

কামরুল হাসান

মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। এমনিতে ফ্লাইট ডিলে (Delay, দেরি)। আরো ডিলে হলে আজ রাতে তেহরানের ফ্লাইট মিস করবো। এটা মিস করলে পুরো এক সপ্তাহ আটকে থাকতে হবে। নেক্সট উইকের আগে আর ফ্লাইট নেই। এদিকে আমার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এসব সাত–পাচ ভাবতে ভাবতে সিড়ি বেয়ে উঠে প্লেনে আসন নিলাম।

একটু পরই এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। গরমে ঘেমেনেয়ে একাকার। গায়ের কোট খুলে উপরের ক্যারিয়ারে রেখে দ্রুত হাতে মুখের ঘাম মুছছিলেন। সঙ্গে ছোট একটি তার মেয়ে। বয়স বছর চারেক হবে। মেয়েটি চিৎকার করে কাদছে আর বলছে, আম্মুর কাছে যাবো ভদ্রলোক কিছুতেই সামলাতে পারছেন না। অসহায়ের মতো এদিক–ওদিক তাকিয়ে বললেন, Please help me. Can you speak Bengali? প্লিজ হেল্প মি। কাম ইউ স্পিক বেংগলি। প্লিজ আমাকে সাহায্য করুন। আপনি কি বাংলা বলতে পারেন?

তার আর্তি শুনে পাশের সিটের এক স্প্যানিশ মহিলা মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, please come on. প্লিজ কাম অন। আসুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটি চিৎকার করে কেদে চলেছে। কাদতে কাদতে বলছে আম্মুর কাছে যাবো।

তার কান্না দেখে পিআইএ (PIA)–এর ফ্লাইট অ্যাটেনডেন্ট এগিয়ে এসে বললেন, বাচ্চা কিউ রোতা হ্যায়?

কেউই তাকে সামলাতে পারছে না।

ভদ্রলোক এদিক–ওদিক তাকিয়ে করুণ সুরে বললেন, Can you speak Bengali? ক্যান ইউ স্পিক বেংগলি?

আমি এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিলাম। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে জিজ্ঞাসা করলাম, কাদছো কেন?

ও তেমনিভাবে বললো, আম্মুর কাছে যাবো।

এবার ভদ্রলোকের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। তিনি কিছুটা বিচলিত হয়ে বললেন, সে শুধু বাংলা বলতে পারে কিন্তু আমি বাংলা জানি না।

তিনি মেয়েটির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, সাবরিনা আস–স।

বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার মেয়ে?

তিনি হেসে বললেন, জি হ্যা। আমি নূরদ্দীন। ইজিপশিয়ান। সাবরিনার মা বাংলাদেশি।

ব্যাপারটা এতোক্ষণ পরিষ্কার হলো। এর মাঝে সাবরিনা ক্লান্ত হয়ে আমার কোলে বসে বাদাম চিবুচ্ছে দেখে তার বাবা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

নিজেই বলতে শুরু করলেন, আমি ফার্মাসিস্ট। আলেকজান্দ্রিয়ায় পড়াশোনা করেছি। কাজ করতাম বাগদাদের এক হাসপাতালে। সেখানে তার মায়ের সঙ্গে পরিচয়। তার মা নার্স। যুদ্ধের সময় আমি ইজিপ্টে ফিরে যাই। প্রায় বছরখানেক আমার কন্যা ও পরিবার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন। তিন সপ্তাহের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলাম স্ত্রী এবং কন্যাকে দেখতে।

আপনার স্ত্রীকে দেখছি না যে? এ প্রশ্নে নূরদ্দীনের মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মুখে হাসি টেনে বললেন, তার কিছু কাজ আছে সেগুলো সেরে মাসখানেক পর আসবে। বুঝতে পারলাম তার বলতে দ্বিধা আছে। আর প্রশ্ন করিনি।

বেশ কিছুক্ষণ আগে বাংলাদেশের আকাশ ছেড়ে এসেছি। ইনডিয়ার ওপর দিয়ে উড়ে চলেছি। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগলো বাংলাদেশ?

হেসে ফেললেন নূরদ্দীন। বাংলাদেশে এই প্রথম আসা। তারপর জামাই মানুষ। শ্বশুরবাড়ি রাজশাহী। প্রতিদিনই বাড়িতে লোকজন তাকে দেখতে আসতো।

ঢাকা কেমন লেগেছে?

প্রচণ্ড গরম আর বৃষ্টি। রিকশা, যানজট আর মানুষের ভিড়। এর চেয়ে রাজশাহী কিছুটা ভালো লেগেছে।

সাবরিনা আবারও কান্না শুরু করে দিল।

আমি নূরদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, একে সামলাবেন কি করে? খুব ভুল করেছেন মা ছাড়া এতোটুকু বাচ্চাকে নিয়ে এসে।

নূরদ্দীন ম্লান হেসে বললেন, কায়রো নিয়ে যাবার পর অসুবিধা নেই। সেখানে আমার বাবা–মা, ভাইবোন সবাই আছেন। তাকে আরবি শেখাবো।

নূরদ্দীন হাত বাড়িয়ে সাবরিনাকে ডাকলেন। সাবরিনা কিছুতেই যাবে না। নূরদ্দীন কিছুটা জোর করেই মেয়েকে নিয়ে গেলেন। সাবরিনার একটানা কান্নায় ফ্লাইটের যাত্রীরা কিছুটা বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। লজ্জিত নূরদ্দীন কিছুতেই তাকে সামলাতে পারছেন না। তার আরবি, ইংরেজি কিছুতেই বুঝতে পারছে না সাবরিনা। আর সাবরিনার আঞ্চলিক বাংলা তার বাবা বুঝতে পারছেন না। তাকিয়ে দেখলাম অসহায় পিতা–কন্যাকে।

ভাষার ব্যবধান যাদের আপন করতে পারছে না। আমার দিকে তাকিয়ে নূরদ্দীন আবারও সাবরিনাকে ফিরিয়ে দিলেন। এর মাঝে রাতের খাবার সার্ভ করা হয়েছে। মেয়েকে নূরদ্দীন শত চেষ্টা করেও কিছুই খাওয়াতে পারে নি।

আমাকে অনুরোধ করলেন, একটু চেষ্টা করে দেখুন কিছু খাওয়াতে পারেন কি না। আজ সারা দিন সে কিছু খায়নি।

অনেক চেষ্টার পর তাকে ফিরনি খাওয়াতে পারলাম। বেশ খেল। তা দেখে তৃপ্তিতে বাবার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল। এর মধ্যে প্লেন ল্যান্ডিংয়ের ঘোষণা ভেসে এলো মাইক্রোফোনে।

আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে করাচি কায়েদে আযম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি। নূরদ্দীন তার ইজিপশিয়ান পাসপোর্ট বের করে এমবারনেশন কার্ড পিনআপ করতে পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। দেখলাম সাবরিনার ছবি আটা রয়েছে।

প্লেন ল্যান্ড করেছে।

নূরদ্দীন বললেন, আপনি শুধু সাবরিনাকে নিন। বৃফকেস আমার হাতে দিন।

আমি সাবরিনাকে নিয়ে নামলাম। সে কাদতে কাদতে জিজ্ঞাসা করলো, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

মিথ্যা বললাম, আম্মুর কাছে।

এবার ছাড়াছাড়ির পালা। সাবরিনা আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। নূরদ্দীন জোর করে তাকে কোলে তুলে নিলেন। চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, বলো শুকুর আমু।

সাবরিনা কিছুই বুঝলো না। হাত বাড়িয়ে আবারও কান্নায় ভেঙে পড়লো।

হাত নেড়ে বললাম, খোদা হাফেজ। নূরদ্দীন, মেয়েসহ যাত্রা শুভ হোক।

নূরদ্দীন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হেসে বললেন, সাহায্যের জন্য আপনাকে মনে থাকবে। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ।

চলে গেলেন ওরা।

সাবরিনার বাবা তার ঠিকানা দিয়েছিল। প্রতিদিনের নানান কাজে আর লেখা হয়ে ওঠেনি। জানি না সাবরিনা কেমন আছে? ভিন্ন পরিবেশে তার দিন কেমন কাটছে? তবে আমার হৃদয়গত প্রার্থনা সাবরিনা ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, আনন্দে থাকুক।

টরন্টো, কানাডা থেকে

লাহোর- দিল্লি

পর পর পাচ দিন তেজগাও এয়ারপোর্টে এলাম। কিন্তু প্লেন উড়লো না। কারণ আবহাওয়া খারাপ।

অপেক্ষার পালা সাঙ্গ হলো ষষ্ঠ দিনে। উড়াল দিলাম লাহোরের পথে। আজ থেকে বাহান্ন বছর আগের অর্থাৎ ১৯৫৪ সালের ঘটনা বা ভ্রমণ সম্পর্কে লিখছি। জীবনে প্রথম প্লেনে চড়লাম। আমার বয়স তখন আঠারো।

উড়লো প্লেন। যাত্রী একশ বিশজন। প্লেনটির প্রস্তুতকারীর নাম ভুলে গেছি। তবে এটুকু মনে আছে, প্লেনের পাশ দিয়ে নয় বরং বর্তমানের বি–বায়ান্ন বম্বার প্লেনের মতো পেটের নিচের সিড়ি বেয়ে প্লেনে উঠেছলাম। প্লেনের ভেতরটা সুন্দর। দুজন এয়ারহস্টেস এবং একজন স্টুয়ার্ড স্বাগত জানালেন। সেদিন লাঞ্চে তারা বিরিয়ানি সার্ভ করেছিলেন।

তখন পর্যন্ত পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের সৃষ্টি হয়নি। সে সময় আকাশ যাত্রী পরিবহন প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজ। এই কম্পানির মালিক ছিলেন এমএম ইস্পাহানি। ঢাকা থেকে কম্পানিটি ব্যবসা পরিচালনা করতো। পিআইএ চালু হওয়ায় ওই প্রাইভেট কম্পানি গিলে খাওয়া হলো। তখন সারা পাকিস্তানে কর্পরেশন শাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। এসব কথা ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৫ সালের।

লাহোর যাচ্ছি। অদ্ভুত এক দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। মায়ের দূরসম্পর্কের এক খালা অর্থাৎ আমার নানিকে লাহোরে তার স্বামীর কাছে লাহোরে পৌছে দিতে হবে। টেলিফোনে তার বিয়ে হয়েছিল। নানির নাম সালমা। বয়স বাইশ। তিনি তখন পর্যন্ত স্বামীকে দেখেননি। ছবি দেখেছেন মাত্র। নানি খুব সুন্দরী, উচ্চতা পাচ ফিট চার ইঞ্চি। খুবই আলাপী। বিএসসি পাস করেছেন। পরিচয়ের দুই তিন দিনের মধ্যে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হলো। অতি সত্বর একে অপরের খুব কাছে চলে এলাম। ঘনিষ্ঠতার নমুনা শুনুন।

সালমা : মাসুম, তোমার কোনো বান্ধবীকে চুমু খেয়েছো?

মাসুম : হ্যা, খেয়েছি। নানি, তুমি কাউকে চুমু খেয়েছো কি?

সালমা : না, চুমু খাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার নেই। এবার বলো, তুমি কোনো মেয়ের সঙ্গে বিছানায় শুয়েছো?

মাসুম : না, সে অভিজ্ঞতা নেই।

সালমা : আমারও নেই।

মিথ্যা বললাম। আমার বয়স যখন ষোলো তখন বিজয়াবৌদি (বয়স ছাব্বিশ) আমাকে বিছানায় টেনে নিয়েছিলেন। ছয় মাস ধরে প্রায় প্রতি রাতে আমাকে যৌবনধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। বদ্ধ ঘরে নারী–পুরুষ দৈহিক যেসব উত্তেজনাকর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে যথা স্পর্শ, চুমু, মর্দন, চোষণ, দংশন সবই হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে ছাব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম। ইচ্ছা করেই মিথ্যা বললাম। কেননা নানিকে মনে ধরেছে। সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য উগ্রীব ছিলাম।

প্লেন উড়ছে দিল্লি–লাহোরের পথে। আমরা পাশাপাশি সিটে বসা। নানি আমার হাত নিয়ে খেলা করছেন। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা করেই তিনি আমার হাতটা বুকে চেপে ধরছেন। নানিকে ডিঙিয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, শাদা পেজা তুলার মতো মেঘের ওপর ভাসছি। তখনই চোখ আটকে গেল নানির দুধে–আলতা রঙের দুটো স্তনের ওপর। লো কাট ব্লাউজের ফাকে বসার ভঙ্গিমায় স্তনের উপরিভাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আস্তে করে আঙুল দিয়ে ঘষা মতোন স্পর্শ করলাম।

নানি শিউরে উঠলেন।

প্রায় ঘণ্টা পাচেক উড়ে দিল্লির পালাম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম। টারমাকে গিয়ে চা, কফি এবং অন্য পানীয় পান করে সব যাত্রী আবার প্লেনে উঠলাম। এবার ঘণ্টা দুয়েক উড়ে লাহোর এয়ারপোর্টে এলাম। নিচে আলোয় উদ্ভাসিত রানওয়ে দেখা যাচ্ছে। তারপরই ঘটলো অঘটন। প্লেন হঠাৎ কাটা ঘুড়ির মতো শো শো করে নিচে নেমে যেতে থাকলো।

যাত্রীরা ভয়ে চিৎকার দিলেন। হস্টেসরা সবাইকে সিটবেল্ট বাধতে বললেন। আমার তলপেট থেকে একেবারে লিঙ্গের গোড়া পর্যন্ত ভীষণভাবে শির শির করে উঠলো। মনে হলো, শূন্যে কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্লেন অতি দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে।

প্লেনের মধ্যে আবার চেচামেচি শুরু হলো। ভয়ে নানি আমার কোলে এসে ওঠেন আর কি! হাত দিয়ে তার দেহ বেড় দিয়ে স্তন খুব জোরে চেপে ধরে তাকে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছি। ধীরে ধীরে প্লেনের ওঠা–নামা থামলো। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

জানলাম, একে বলে এয়ারপকেট।

এদিকে লাহোরের আর দেখা নেই। প্লেন চলছে তো চলছেই।

অনেক পরে ক্যাপ্টেন মাইকে ঘোষণা দিলেন, প্লেন প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পতিত হয়েছিল। আমরা এখন দিল্লি ফিরে যাচ্ছি। সেখানে রাত কাটিয়ে খুব ভোরে লাহোর যাবো।

দিল্লি এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্টে ডিনার খেয়ে শহরের হোটেলে গেলাম রাত নয়টার দিকে। আমাদের দুজনকে একটি রুম দেয়া হলো। রাতে শোয়ার কোনো পোশাক ছিল না। তাই হোটেলের লবির দোকান ঘুরে নানি দুজনের জন্য দুটি সিল্কের লুঙ্গি, দুটি আদ্দির স্বচ্ছ শাদা পাঞ্জাবি, টুথব্রাশ ও পেস্ট কিনে আনলেন। কিছু বিস্কিট, সিঙারা ও কোল্ড ড্রিংকসও কেনা হলো। রাতে কিংবা সকালে খাওয়া যাবে।

পরনের কাপড় বদলে লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরলাম। নানি বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন শুধু স্বচ্ছ আদ্দির পাঞ্জাবি পরে। পাঞ্জাবির ঝুল তার নিতম্ব এবং সামনের তলপেটেরও নিচের অংশ ঢেকে থাইয়ের অর্ধেক পর্যন্ত গেছে। তার দিকে তাকিয়ে হা হয়ে গেলাম।

দুধে-আলতা গায়ের রঙ এবং স্তনের বোটার খয়েরি রঙ স্বচ্ছ পাঞ্জাবির মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুই হাত বাড়িয়ে দিতেই নানি আমার আলিঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়লেন।

দুজনে মুখের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে তাড়িয়ে চুমু খেলাম অনেকক্ষণ। নানি আমাকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট স্বরে বলতে থাকলেন, অভিজ্ঞতা মাসুম, অভিজ্ঞতা চাই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই কামনার আগুনে আমাদের দেহ পুড়তে থাকলো। কখন বিছানায় গেছি তা মনে নেই। শুধু মনে আছে, সারা রাত ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ কর্ণফুলি নদীর ঊর্মি রাশির মধ্যে পতিত সাম্পান নৌকার মতো ভাসতে ভাসতে এবং আছাড়ি-পিছাড়ি করতে করতে দুটি দেহ যৌনধর্মের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হলো।

ভোর পাচটায় হোটেল থেকে যাত্রা করলাম। কুতুব মিনারের পাশ দিয়ে এয়ারপোর্টে এলাম। আবার উড়লাম লাহোরের পথে। সকাল প্রায় এগারোটায় লাহোর এয়ারপোর্টে নামলাম। নানিকে নতুন বৌয়ের মতো মুখে মধু দিয়ে রহিমনানা এবং আমি ঘরে তুললাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

ঢাকা থেকে

বিপত্তি

ড. ইসলাম

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। ঢাকা থেকে বস্টন ফ্লাইট। বাংলাদেশ থেকে ঢাকা টু লন্ডন বাংলাদেশ বিমানে এবং লন্ডন টু বস্টন টিডাবলিউএ-তে। লন্ডন-বস্টন ফ্লাইটে যাত্রী বোঝাই ছিল। প্রায় সকল যাত্রী শাদা চামড়ার। পুরুষ-মহিলা সবাই মদ খাচ্ছিল। আমি রীতিমতো শংকিত ছিলাম তাদের মদ খাওয়া দেখে।

লন্ডন টু বস্টনের আট ঘণ্টা ফ্লাইটের চার ঘণ্টা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর আমার টয়লেটে যেতে হয়েছে। ভুলে টয়লেটের দরজা বন্ধ করিনি। হঠাৎ করে এক শাদা চামড়ার ভদ্রলোক, খুব সম্ভবত আইরিশ, টয়লেটে ঢুকে আমাকে বলে ওকে সডোমাইজ (Sodomise) করতে।

আমি না বলায় সে আমাকে গলা টিপে হত্যার হুমকি দেয়। তখন বাধ্য হয়েই টয়লেট বন্ধ করে তাকে সডোমাইজ করতে হয়। সে খুব আরাম পায় এবং আমাকে একশ ডলার উপহার দেয়।

বস্টনে পাচ বছর অবস্থানকালে এ কথা সব সময় মনে হতো এবং ভয়ে ভয়ে থাকতাম।

ঢাকা থেকে

স্বামী ভাগ্য

তাজকেরা খানম নীলু

প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির ব্যবধান ঘোচানোর সব স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে বাবা-মায়ের পছন্দের ছেলেকে যখন বিয়ে করলাম তখন আমি নিতান্তই এক অবুঝ বালিকা। অনভ্যস্ত জীবনে হোচট খেতে খেতে আমি যেন হয়ে গেলাম অন্য আমি। তাই স্বজনরা যখন আমার পড়ালেখার ক্ষতির কথা ভেবে হায় আফসোস করছিলেন তখন ব্যাপারটাকে রসিকতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি।

পড়াশোনার দোহাই দিয়ে যখন বিয়েটা পেছাতে চেয়েছিলাম তখন তারাই বলেছিলেন বিয়েকে প্রতিবন্ধক না ভেবে বরং সহায়ক হিসেবে ভাবতে। কারণ এরপর বখাটেদের উপদ্রব থাকবে না। কি অকাট্য যুক্তি !

বিয়ের পর তাদের চাওয়া না চাওয়াকে আমলে নিতে চাইনি। আমার নিস্পৃহ ভাব দেখে তারা ঠেসে ধরে নিরীহ গোবেচারা স্বামীটিকে। সে যৌক্তিক-অযৌক্তিক কথামালায় পেচিয়ে আমাকে হার মানতে বাধ্য করে। তার ইচ্ছায় আইএ পাস করি। এবার সে আমাকে বিএ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে বলে। কিন্তু কোনো উৎসাহ বোধ করি না। কেবলই মনে হয়, এতো গলদঘর্ম হয়ে শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের কোনো মানে হয় না।

পড়াশোনা নিয়ে আমার যতো স্বপ্ন-সাধ তা পূরণের পথে বিয়ে বেড়িবাধের মতো অন্তরায় হয়ে আছে। সুতরাং পড়াশোনা শিকেয় তুলে ঘোর সাংসারিক হতে চেষ্টা করলাম। এক পুত্র সন্তানের মা হলাম। এবার আমার স্বামী আবার শুরু করলো সেই ঘ্যানর-প্যানর, বিএ পাস করে গ্র্যাজুয়েট হও। তার অতি আগ্রহের কারণে কৌশলী হতে চেষ্টা করলাম।

বললাম, তোমার আশা মেটালে আমার লাভ?

সে ভালো ব্যবসায়ীর মতো মেগা অফার ঘোষণা করলো। কক্সবাজারে দুদিন থাকা-খাওয়াসহ প্লেনের টিকেট ফৃ।

লুফে নিলাম। শুরু করলাম পড়াশোনা আর কক্সবাজার ভ্রমণের নানান পরিকল্পনা। এবার কষ্টটা একটু বাড়তি। কারণ ছেলেও সামলাতে হয় যদিও তার আন্তরিক সহযোগিতার অভাব ছিল না। পরীক্ষা শেষ হলো ভালোভাবেই।

এবার অপেক্ষা ভালো রেজাল্ট ও ভ্রমণের। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে কিছুদিন পরই সে প্লেনের টিকেট হাতে তুলে দিয়ে জানায়, ঝামেলা এড়াতে হোটেলের রুমও বুকিং দেয়া হয়ে গেছে।

আমি হাওয়ায় উড়ে বেড়াই এক শপিং সেন্টার থেকে অন্য শপিং সেন্টারে। আমার ভেতরে-বাইরে অস্থিরতা হুলুস্থুল ভজঘট বেধে যায়। নির্ধারিত দিনে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে ঢাকা থেকে আসা আমার দৃষ্টিতে এক বড়সড় প্লেনে চড়ে বসি। রানওয়েতে যখন প্লেন ওঠার জন্য লাইন ধরে এগুচ্ছিলাম তখনকার অনুভূতি একেবারে অন্য রকম। শাদা ধবধবে প্লেনে ওড়ার বাসনা ঠিক কবে থেকে পোষণ করেছিলাম জানি না, তবে প্লেন যখন শূন্যে উড়ে চলছে তখন মনে হয়েছে, অনেক দিনের গোপন কোনো স্বপ্ন আজ পূরণ হচ্ছে।

কৃতজ্ঞতায় স্বামীর হাত ধরে বসে থাকি। সে আমার আঙুলগুলো তার পাচ আঙুলের ভেতর গলিয়ে শক্ত করে আটকে রাখে।

প্লেনের জানালা দিয়ে মেঘের ভেসে থাকা দেখি, দেখতেও ইচ্ছা করে ছুয়ে। কিছুক্ষণ পর এয়ারহস্টেস আমাদের জুস পরিবেশন করেন। আমি ছেলেকে আকাশ দেখাই, নরম তুলতুলে মেঘ দেখাই। সে বুঝতে না পারলেও দেখাতে আমার খুব ভালো লাগছিল।

মেঘ সরে গেলে নিচে খুব ক্ষুদ্র ঘরবাড়ি দেখতে পাই। তখন অনুভব করি, মানুষ খুবই ক্ষুদ্র প্রাণী। এতো ক্ষুদ্রতা নিয়েও মানুষের এতো অহংকার, আস্ফালন! কিছুক্ষণ পরই প্লেন কক্সবাজারে ল্যান্ড করে। মাত্র সতেরো মিনিটের এই প্লেন ভ্রমণ আমাকে দিয়েছে অপার আনন্দ। এ আনন্দটুকু ধারণ করেই কক্সবাজার ভ্রমণ শেষ করি।

ভ্রমণ শেষ হলেও আনন্দের রেশটুকু রয়ে গেছে আমার মনে। এখনো স্মরণ করি সময়ে–অসময়ে, প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে অন্তরঙ্গ আড্ডায়।

এই আনন্দ আর অভিজ্ঞতার যোগান দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিই আমার স্বামীকে আর কৃতজ্ঞতা জানাই সেই মহান স্রষ্টাকে যিনি এমন স্বামী আমাকে দিয়েছেন।

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

যন্ত্র ফড়িং

জাহেদ আনোয়ার মামুন

ছাত্র জীবনে বিএনসিসি বা বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর–এর আমি একজন সক্রিয় ক্যাডেট ছিলাম। প্রতি বছর আমাদের এটিসি (ATC) বা বার্ষিক ট্রেনিং শিবিরে অংশগ্রহণ করতে হয়। ১৯৯৮ সালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আমাদের এটিসি চলছিল।

একদিন ক্যাডেট অ্যাডজুটেন্ট মুনির স্যার ডেকে বললেন, সার্জেন্ট মামুন হ্যাভ এ সারপ্রাইজ ফর ইউ।

শুনেই পিলে চমকে উঠলো। কারণ সিনিয়র ক্যাডেটদের এ ধরনের *সারপ্রাইজ* মানে মাঘ মাসের শীতে পানিতে বসে থাকা অথবা সারা রাত কুয়াশায় দাড়িয়ে শিয়ালের ডাক শোনা। কিন্তু না, এবারের ঘটনা আসলেই সারপ্রাইজ। খুব অল্প সংখ্যক ক্যাডেট আজ বিমান বাহিনীর সঙ্গে একটি মহড়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। আমি সেই অল্প সংখ্যক ক্যাডেটদের একজন।

মেজর আসাদ ছিলেন আমাদের প্রোগ্রাম কো–অর্ডিনেটর। বিকাল তিনটায় সবাই মেজর আসাদের কাছে রিপোর্ট করলাম। তিনি তার স্বভাবসুলভ হাস্যময় ভঙ্গিতে ক্যাডেটদের বৃফ করলেন এবং একই সঙ্গে তার প্রথম হেলিকপ্টার ভ্রমণের সময় তিনি কি পরিমাণ নার্ভাস ছিলেন তার একটি বিবরণ দিলেন।

বিকাল চারটায় আমরা পৌছালাম পতেঙ্গায় বিএএফ সার্জেন্ট জহুরুল হক ঘাটিতে। এখান থেকেই আমাদের উড়তে হবে। ঘাটিতে বিমান শাখার ক্যাডেটস এবং অফিসাররা আমাদের স্বাগত জানালেন। এরপর কিছু সরকারি আনুষ্ঠানিকতা। তারপর বিমান বাহিনীর চৌকস এক অফিসার পুরো মহড়ার বিষয়টি আমাদের সামনে উপস্থাপন করলেন।

বিকাল চারটা চল্লিশ মিনিটে আমরা ওড়ার জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হলাম। ডাবল মার্চ করে পৌছালাম যান্ত্রিক ফড়িং হেলিকপ্টারের দরজায়। আমি হেলিকপ্টারে উঠতে যাবো এমন সময় ডিউটি সার্জেন্ট বললেন, জেন্টলম্যান হল্ট! তুমি কি হেলিকপ্টারে ওড়ার দোয়া জানো?

একি ফ্যাসাদে পড়লাম। নৌকা–যানবাহনে চড়ার দোয়া আছে বলে জানি, কিন্তু হেলিকপ্টারে ওড়ার দোয়া আছে বলে মনে পড়লো না। ডিউটি সার্জেন্ট যেভাবে তাকিয়ে আছেন তাতে মনে হয় দোয়া না জানলে ব্যাটা আমাকে হেলিকপ্টারে উঠতেই দেবে না। বুদ্ধি করে যানবাহনে চড়ার দোয়াটি পড়ে শোনালাম। ডিউটি সার্জেন্ট এবার মুচকি হেসে বললেন, যাও ভেতরে গিয়ে বসো।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ডিউটি সার্জেন্ট তার ও পাইলট অফিসারের পক্ষ থেকে নবীন ক্যাডেটদের স্বাগত জানিয়ে সিটবেল্ট বাধতে বললেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সিট ছাড়তে নিষেধ করলেন। একটু পরই একদল তরুণ ক্যাডেট নিয়ে হেলিকপ্টারটি আকাশে উড়লো।

চিটাগাং এয়ারপোর্টের উপর দিয়ে কর্ণফুলি নদী পার হয়ে আনোয়ারা–দেয়াং পাহাড়ের আকাশ হয়ে যন্ত্র ফড়িংটি চলে এলো বঙ্গোপসাগরের উপরে। নিচে তাকিয়ে দেখলাম সেই চিরচেনা সমুদ্র সৈকতে অনেক দর্শনার্থী শীতের শেষ বিকেলে সূর্যাস্ত উপভোগ করছে। আরো কিছুক্ষণ পর দেখলাম সমুদ্রের বুকে আগুন জ্বলছে।

ডিউটি সার্জেন্ট বললেন, এটি সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড। পাইলট ক্যাডেটদের দেখার সুবিধার জন্য সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে হেলিকপ্টারটি কিছুটা নিচে নামিয়ে আনলেন। চারদিকে সমুদ্রের পানির মধ্যখানে সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ডের আলোকিত দৃশ্য সত্যিই অসাধারণ লাগছিল। আরো কিছুক্ষণ ওড়ার পর হেলিকপ্টারটি পাইলট চিটাগাং এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ফিরিয়ে আনলেন। শেষ হলো আমাদের মহড়া।

এর আগেপরে ইন্টারন্যাশনাল এবং ইন্টারনাল রুটে বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে অনেকবার ভ্রমণ করেছি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ইউনিফর্ম ধারণ করে সামরিক হেলিকপ্টারে উড়তে সেদিন যে রোমাঞ্চ–আনন্দ উপভোগ করেছি, তা আজীবন মনে থাকবে।

দুবাই, ইউএই থেকে

খোকন সোনা

জিয়াউল হক

২০০০ সাল। গালফ এয়ারে কুয়েত থেকে বাহরেইন যাচ্ছিলাম। জানালার পাশেই সিট পড়েছে। একে একে যাত্রীরা তাদের পাসপোর্ট–টিকেট পুনঃতল্লাশি শেষে বিমানের ভেতরে আসছেন এবং হস্টেসদের দেখিয়ে দেয়া সিটে বসছেন। দেখতে দেখতে বিমানটি প্রায় ভরে গেল যাত্রীতে। আমার পাশে পচিশ ছাব্বিশ বছরের এক শ্রী লংকান মহিলা বসলেন। তাদের চেহারা, পোশাক দেখেই সাধারণত চেনা যায় তারা শ্রী লংকান। বিমানে আসন নেয়া থেকেই দেখছি তিনি কাদছেন আর রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন।

বিমান রানওয়েতে। মহিলা নিঃশব্দে কেদেই যাচ্ছেন। একটু অবাক হলাম। বাড়ি যাবার সময় কি কেউ কাদে! মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কাদে জানি, তাও জীবনে প্রথমবার অথবা প্রথম দুই একবার। কিন্তু পুরো দস্তুর বৌ হয়ে গেলে কাউকে কাদতে দেখিনি। ভেবে নিলাম, আমার

পাশের শ্রী লংকান মহিলাকে তার মালিক বা নিয়োগকর্তা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কোনো অপরাধের কারণে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তিনি কাদছেন। এটি মধ্যপ্রাচ্যে চাকরিরত কোনো শ্রমিকের জন্য খুবই চেনা–জানা ঘটনা, প্রায়ই এ রকম হচ্ছে।

বিমান আকাশে উঠছে। মাত্র মাটি ছেড়েছে। দ্রুত উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। জানালা দিয়ে নিচের জগত দেখছি, দ্রুত ছোট হয়ে আসছে ঘরবাড়ি। ওই তো ফরওয়ানিয়া, ওই যে ওদিকে হাসাবিয়া–আব্বাসিয়া, বাংলাদেশিদের এলাকা বলে পরিচিত এলাকা দুটো।

হঠাৎ টের পেলাম আমার পাশ থেকে মহিলা একটুখানি হেলে আমারই দিকে ঝুকেছেন, জানালা পানে দেখার জন্য। মনে হলো আমার গায়ের সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন।

বিব্রত হলাম। জানালার দিক থেকে মুখ সরিয়ে একটুখানি পেছনে হেলে বসার চেষ্টা করলাম। এখন তো সিটটাকে পেছনেও ঠেলে দেয়া যাবে না, কারণ বিমান এখনো উঠেই যাচ্ছে। তাই সিটের সঙ্গে লেপ্টে যেতে চাইলাম নিজেকে পেছন দিকে ঠেলে। জানালা খালি পেয়ে ভদ্র মহিলা সিটবেল্ট বাধা অবস্থাতেই ঝুকেছেন জানালার দিকে। খুব আগ্রহ নিয়ে দেখার চেষ্টা করছেন নিচের দিকে, নিচের কুয়েত শহর।

কি দেখলেন তা জানি না, হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকরণ বিবর্জিত ভুল আরবিতে প্রশ্ন করলেন, *হোয়েন হাদা দওরা আজম?*

আমি তার চোখের দিকে এই প্রথম তাকালাম। চোখ দুটো রক্তজবার মতো লাল টকটকে। ফুলে গেছে, কেদে কেদেই বোধহয়। বড় মায়া হলো। আবার জানালা দিয়ে নিচের দিকে তাকালাম। বিমান কুয়েত শহরের ওপরেই, এখন এটি ডানে একটা লম্বা বাক নেবে এবং সোজা ওড়া শুরু করবে। আমার বাম পাশে নিচে সাগর। সুয়েখ পোর্টকে ঠিক আমাদের বাম দিকে রেখে চলেছি। একটু পেছনের দিকে চাইলাম, ওই তো পেছনে সেই বিরাট গোলচক্কর, *দওরা আজম* (বর্তমান নাম ইউনাইটেড নেশন স্কয়ার)। তাকে দেখার চেষ্টা করলাম। বললাম, ওই তো ওইখানে।

ভদ্রমহিলা আরো একটু ঝুকলেন, কিন্তু বিমান ততোক্ষণে ডানে বাক নিতে শুরু করেছে। আমার দৃষ্টিসীমা থেকে তা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারও নজরের বাইরে চলে গেল, এখন তা একেবারে আমাদের পেছন বরাবর। ফলে দেখতে পাবার প্রশ্নই ওঠে না।

ভদ্রমহিলা সিটে বসেই ছটফট করলেন, বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। অবাকই হলাম। এরই মধ্যে এয়ারহস্টেস খাবার পরিবেশন করেছেন। তিনি খাবার, এমনকি এক কাপ চা বা কফিও নিলেন না। আমি খেয়ে সিটের সঙ্গে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করছি। ঘুম আসছে না। আসবে না জানি। তবুও চোখ বন্ধ করে বসে আছি।

যথাসময়ে আমরা মানাম নামলাম। আমাকে এখানে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে হবে। আনুষ্ঠানিকতা সেরে বিরাট যাত্রী লাউঞ্জের এক কোণে বসলাম। বৃফকেস থেকে কাগজ বের করলাম। লিখবো এখন। সময়টাকে কাজে লাগাই।

ঘণ্টা খানেক কেটে গেছে। হঠাৎ খুব কাছে কারো উপস্থিতি টের পেলাম। চোখ তুলে দেখি বিমানের ভেতরে আমার পাশের সিটের সেই মহিলা। সামনে এসে দাড়িয়েছেন, কিছু বলবেন মনে হলো। চোখাচোখি হতেই তিনি ভাঙা ও ভুল আরবিতে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি দওরা আজমের পাশে *মুসতাশফা শুউন* চিনি কি না।

আসলে তিনি যেটাকে হাসপাতাল বলছেন সেটা হলো কুয়েত সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র। সেখানে জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের রাখা হয়। কেন্দ্রটি আরো একটা বিশেষ কাজের জন্য প্রবাসীদের অতি পরিচিত। কুয়েতের বাসা-বাড়ি বা অন্য কোথাও কাজ করতে এসে অনেকেই বিয়ে বহির্ভূত যৌনতায় জড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া কুয়েতি নিয়োগকর্তা বা তার বাড়ির পুরুষ সন্তান বা ভাইদের হাতেও অনেক প্রবাসী মহিলা, বিশেষ করে বাসার কাজের মেয়েরা নির্যাতিত হয়। গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই কুয়েতিরা আগেভাগেই *ম্যানেজ* করে নেয়। কিন্তু সমস্যা বাধে যখন সে রকমটি হয়ে ওঠে না, প্রেগনান্সিটা অ্যাডভান্স স্টেজে চলে আসে। তখন সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে এবং যেই না সন্তান প্রসব হয় অমনি তাকে *পথে কুড়িয়ে পাওয়া* হিসেবে ওই সমাজকল্যাণ কেন্দ্রে রেখে আসে। সরকার তাদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব বহন করে।

তাকে ওই কেন্দ্রটির খোজ নিতে দেখে আমার কৌতূহল বাড়লো। বললাম, হ্যা, আমি চিনি এবং তার পাশেই আমার কর্মক্ষেত্র, মেন্টাল হসপিটাল*।*

তিনি পাশের চেয়ারে বসলেন। আবারও প্রশ্ন করলেন, তুমি কি ছুটিতে যাচ্ছ?

বললাম, *একটু জরুরি কাজে যাচ্ছি, দুই সপ্তাহ পরেই ফিরবো।*

ভদ্রমহিলা আমার একটি হাত ধরে ফেললেন। তার দুইচোখ দিয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে। কাতর কণ্ঠে বললেন, তুমি কি আমার একটি উপকার করতে পারো?

হাতটি ছাড়িয়ে নিলাম। বলো দেখি কি করতে হবে। সম্ভব হলে চেষ্টা করবো।

তার কথার সারমর্ম হলো, তার নাম চম্পা। বিয়ে হয়েছিল নিজ দেশেই। গৃহযুদ্ধে স্বামী, ভাই হারিয়ে সংসারের হাল ধরতে দুই বছর আগে কুয়েতে আসেন। কুয়েতির বাসায় খাদ্দামা হিসেবে কাজ শুরু করেন। মালিক প্রায় সারা বছরই আমেরিকা অথবা সুইটজারল্যান্ডে পড়ে থাকেন সপরিবারে। তার বৃদ্ধ পঙ্গু বাবাকে দেখাশোনার জন্য খাদেম-খাদ্দামা, বাবুর্চি, ড্রাইভার সব রেখেছেন। তারাই বাড়ির হর্তাকর্তা। মাঝে মধ্যে কুয়েতির ইজিপশিয়ান কর্মচারী (স্থানীয় ভাষায় মন্দুব বলে) এসে তাদের খোজখবর নেন, বেতন দেন, বাজারঘাট যা লাগে করে দিয়ে যান।

এখানেই এক ইনডিয়ান ড্রাইভারের সঙ্গে তার মন দেয়া-নেয়া, বিয়ের আশ্বাস, শারীরিক সম্পর্ক পর্যন্ত গড়ায় এবং এক পর্যায়ে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। মালিকের ভয়ে তার ইনডিয়ান প্রেমিককে বার বার বলেছেন একটা ব্যবস্থা করতে। প্রেমিকপ্রবর ইজিপশিয়ান মন্দুবের সঙ্গে পরামর্শ করলে তিনি মালিককে বলে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। বিনিময়ে অবশ্য দেড়শ দিনার উভয়ের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন। তারই ভরসায় তারা নিশ্চিন্তে প্রসবের অপেক্ষায় থাকলেন। হাসপাতালে যেতে পারেননি পুলিশের ভয়ে।

এরই মাঝে কুয়েতি এলেন। সব শুনে তো মহা খাপ্পা! ভাবগতি বুঝে আগেভাগেই সেই প্রেমিকপ্রবর লাপাত্তা! পুলিশের খাতায় পলাতক হিসেবে মালিক তাকে নথিভুক্ত করে রাখলেন। কিন্তু বিপদ হলো চম্পার। পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। পুলিশ তাকে যেদিন নিয়ে গেল জেলখানায়, তার ঠিক চার দিনের মাথায় প্রসব বেদনা উঠলে হাসপাতালে নেয়া হলো। চম্পা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তিনি হাসপাতালে থাকতেই জ্বরে আক্রান্ত হলেন। একটানা আট দিন ভুগলেন। এ কয়দিন সন্তান তার কাছেই ছিল। কিন্তু নবম দিন সকালে দুই

মহিলা এসে তার কোল থেকে সন্তানকে নিয়ে গেল। তার গলা ফাটানো কান্না কেউ আমলেই নিল না।

ও যে পাপের ফসল! কেউ একবারও ভাবলো না তার কোনো দোষ নেই! ওই ছোট বাচ্চা কার কাছে থাকবে? থাকবে তো আয়াদের কাছে যাদের সঙ্গে তার কোনো আত্মিক, মানসিক বা নাড়ির সম্পর্ক নেই। সে কাদবে আর কাদবে, কেউ কি একবারও তাকে আদর করে কোলে তুলে নেবে, মাতৃদুগ্ধ পান করাবে? না, করাবে না। তার কি দোষ? ও কেন এতো কষ্ট ভোগ করবে? আমাকে আরো কিছুদিন তার কাছে রাখলে কি অপরাধ হতো? অথবা আমার সঙ্গে তাকেও দিয়ে দিলে তো হতো, আমি তাকে নিয়ে যেতাম, খেয়ে না খেয়ে মানুষ করতাম।

তার কথাগুলো বার বার আটকে যাচ্ছিল উপচে পড়া কান্নায়। বসে বসে কিছুক্ষণ কাদলেন তিনি। তারপর আবারও রুমালে চোখ মুছে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, *তুমি না বললে তুমি ওই হাসপাতালের পাশেই মেন্টাল হসপিটালে চাকরি করো?*

বললাম, *হ্যা।*

তিনি যেন একটি সূত্র পেলেন। আরো একটু কাছে এগিয়ে বসলেন। আমার হাতের ওপরে আলতো করে তার হাত রাখতে গেলে হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, *তুমি বলো আমি শুনছি।*

তুমি এমন কাউকে চেনো যে ওখানে চাকরি করে? তুমি কি তার সহযোগিতায় আমার ছেলেটাকে একনজর দেখে আসতে পারবে না?

বললাম, সেখানে অনেক বাংলাদেশি চাকরি করেন। আমার এক বন্ধুপত্নীও আছেন। কাজেই সেটা সমস্যা নয়। সমস্যা হলো তোমার ছেলেকে চিনি না। মাত্র নয় দিনের বাচ্চা কি করে চিনবো এবং তাকে দেখে এলেই বা তোমার কি লাভ হবে?

তিনি কিছু একটা ভাবলেন।

তাই তো আমি দেখে এলে তার কি লাভ হবে? আবার বললেন, তুমি একনজর দেখে এসো, তুমি ইচ্ছা করলেই তাকে খুজে বের করতে পারবে। তুমি দেখলেও আমি বুঝবো এমন একজন তাকে দেখেছে যে জানে তার এই হতভাগী মায়ের বুকে কতো কান্না। কতো হাহাকার।

ততোক্ষণে মাইকে ঘোষণা শুরু হয়েছে, কলম্বোগামী যাত্রীদের ডাকা হচ্ছে। তিনি উঠে দাড়িয়েও এগোলেন না, আমার দিকে তাকিয়েই থাকলেন। কিছু একটা বলতেই হয়, অন্তত একজন মাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য হলেও।

বললাম, আমি চেষ্টা করবো আমার পরিচিত ইনডিয়ান বাংলাদেশি কর্মচারীদের সাহায্যে খুজে বের করতে। তাদের বলবো, তারা যেন তোমার ছেলের দেখাশোনা করে।

খুবই খুশি হলেন তিনি। নুয়ে পড়ে অপ্রস্তুত করে দিয়ে আমার একটি হাত তুলে তার উল্টো পিঠে চুমা খেলেন। বললেন, *ঈশ্বর তোমার ভালো করুক।*

তার দুই চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরছে। তিনি ঘুরে দাড়ালেন যাবার জন্য। কি ভেবে একটু দাড়ালেন, বললেন, তুমি যদি কুয়েতে আরো অনেক দিন থাকো আর আমার ছেলেটো ততোদিন যদি বেচে থাকে, বড় হয় তাহলে তাকে আমার কথা বলো, বলো সে যেন মানুষ হয়। বলো, মানুষ হতে পারলে তার কোনো দুঃখ থাকবে না! বলেই তিনি এগিয়ে গেলেন।

আমি তার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকলাম। চেকইন–এর গেট দিয়ে ঢোকার আগে সেই দূর থেকেই তিনি আবারও চাইলেন। হাত নাড়তে দেখলাম তাকে। মাথাও নাড়ালেন। আমি শুনলাম

না তিনি কি বলছেন তবে বোধহয় বুঝলাম। তিনি বলছেন, *আমার ছেলেটাকে মানুষ হতে বলো, তাকে আমার কথাটা পৌছে দিও, কেমন!*

অজান্তেই আমিও হাত নাড়লাম তার উদ্দেশে। কিন্তু আমার মন, মননে তখন বেজে চলেছে সেই ছোটকালে শোনা বাংলা গানের চরণ, *খোকন সোনা বলি শোনো, থাকবে না আর দুঃখ কোনো, মানুষ যদি হতে পারো!* বোধহয় এ বিশ্বের সব মায়ের মনের কথাই এটি।

নিউকাসল থেকে
abuarif@yahoo.com

ইচ্ছা পূরণ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন

বাসা সৈয়দপুর এয়ারপোর্টের কোল ঘেষে। একেবারে রানওয়ের পাশে। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কেটেছে বিমানের শব্দ শুনে। প্লেন দেখা বা প্লেনে ওঠার আগ্রহ আমার কখনো ছিল না। এখন বড় হয়েছি। বিয়ে করেছি। দুই ছেলে নিঝুম আর নাবিল। যথাক্রমে পাচ বছর ও দুই মাস।

আমার মতো তারাও প্লেনের শব্দ শুনে বড় হতে চলেছে। নিঝুমের প্লেন নিয়ে আগ্রহ অনেক বেশি। তার পাচ মাস বয়স থেকে লক্ষ্য করছি প্লেনের শব্দ পেলেই বিছানায় শুয়ে কান পেতে শব্দের উৎস খোজার চেষ্টা করতো। আবার কান্নারত অবস্থায় থাকলে কান্না থামিয়ে শব্দ শুনতো। ভাবতাম, হয়তো ভয় পেয়েছে। কিন্তু না ভয়ের বিষয় নয় এক অন্য রকম ইঙ্গিত।

যখন হাটা শিখলো, তখন বিমান এলে যে কি খুশি হতো তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ইশারায় প্লেন দেখতে নিয়ে যেতে বলতো। আমিও ঘাড়ে নিয়ে ছুটতাম প্লেন দেখাতে অথবা অন্য কেউ। নতুবা চিৎকার করে বাসা মাথায় তুলতো। কিন্তু যখন কথা বলতে শিখলো বিষয়টি আরো প্রকট রূপ ধারণ করলো।

প্লেন সম্পর্কিত হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে মহা বিরক্ত বোধ করতাম। প্লেনে কে থাকে, কোথায় যায়, কি খায় ইত্যাদি। এ ধরনের উত্তর বোধহয় কয়েকশবার দিয়েছি, তারপরও উত্তর তার মনপুত হয়নি। তিন বছরের শিশু থাকা অবস্থায় আমি এ ধরনের প্রশ্ন করিনি কখনো, এটা আমার বাবা-মায়ের কথা।

ক্রমে ক্রমে সে প্লেনে ওঠা বা ছুয়ে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করতো কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে তা সম্ভব হয়নি। কথাটা তাকে আজো বোঝাতে পারিনি। অনেকেই বলতো বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু না, কোনোভাবেই ঠিক হয় না বরং বেশি হচ্ছে। খেতে বসলে প্লেন এলে প্লেট ফেলে দৌড়ে ছুটে যাবে। রাতে প্লেন এলে দৌড়ে অন্ধকারে মিশে যাবে। কোনোভাবেই আটকাতে পারিনি।

এজন্য ছেলেটি কতো মার খেয়েছে তার হিসেব নেই। রাতে ঘুমের ঘোরে বিড় বিড় করতো প্লেন নিয়ে। অনেক সময় দুঃখ হতো তাকে মারার জন্য। ছোট বলে মেনে নেই। যদি কোনো কারণে কোনোদিন প্লেন না আসে তাহলে আমাকে বলতো আব্বু প্লেনটা কি নষ্ট হয়ে গেল। মানুষগুলো কি প্লেন ঠিক করতে পারে না? আমি হলে ধাক্কা মেরে নিয়ে আসতাম।

আমি তখন শুধু হাসি।

এখন তার দাবি একবার প্লেনে উঠবে। দাবির রূপ বিভিন্ন যেমন খেতে বসলে বলে খাবো যদি প্লেনে ওঠাও। পড়তে বসলে বলে পড়বো যদি প্লেনে ওঠাও। আমি তখন মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বলি, হ্যা ওঠাবো। কিন্তু জানি আমার মতো একজন ছোট চাকরিজীবীর বিমানে ওঠা শুধু কল্পনাই, বাস্তবে নয়।

তাকে ভোলাবার জন্য সাধ্য অনুযায়ী খেলনার প্লেন কিনে দিয়েছি যাতে তার ইচ্ছাটা দমে যায়। কিন্তু না দুই একদিন খেলার পর ছুড়ে ফেলে দেয়, উড়তে পারে না বলে।

প্রতিমাসেই বলে আব্বু এ মাসের বেতন পেলে আমরা প্লেনে উঠবো। আকাশ দিয়ে অনেক দূরে যাবো।

আমি অন্যমনস্ক থাকি বা না শোনার ভান করি। সে আমাকে ঝাকুনি দেয় হ্যা বলার জন্য, সমর্থন জোগাবার চেষ্টা করে।

আমি জানি হ্যা বললে তার কাছে মিথ্যা বলা হবে। আমি চাই না তার ছোট্ট মনে আমার মিথ্যাটুকু গেথে থাক। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে হ্যা বলতে হয়। তখন তার দুচোখে শুধুই আনন্দের বন্যা দেখতে পেতাম। তার বিশ্বাস আব্বু যেহেতু হ্যা বলেছে এবার সে প্লেনে উঠতে পারবে।

কিন্তু জানি ছোট্ট মনের আবদার আমার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। তার ইচ্ছা পূরণ করতে হলে একটি পরিবারকে পুরো মাস না খেয়ে কাটাতে হবে। পরক্ষণে সান্ত্বনা স্বরূপ বলি লেখাপড়া শিখে তুমি অনেক বড় হলে নিজেই প্লেনে উঠতে পারবে।

সে বলে বেশ, আমি একাই উঠবো। তুমি, আমি, আম্মু আর ছোট্ট ভাইয়া সবাই উঠবো।

তখন আমার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়।

নিজেকে সামলে নিয়ে শুধু ভাবি সন্তানের ইচ্ছা পূরণ করতে না পারা বাবা-মায়ের কি যে কষ্ট তা লিখে শেষ করা যাবে না। শুধু মনে মনে দোয়া করি সে যেন বড় হয়ে তার ইচ্ছাটা পূরণ করতে পারে।

রাইসমিল নিচু কলোনি, সৈয়দপুর থেকে

ব্যতিক্রমী

মোহাম্মদ রাজীব আক্তার সিদ্দিকী

একটা অন্য রকম আকাশ ভ্রমণের কথা আজ লিখবো। ছোটবেলা থেকেই আমরা তিন ক্ষুদে সন্ত্রাসী জোট বেধেছিলাম দুষ্টুমি করার জন্য। আমি, তুহিন আর স্বপন। তুহিন আমার থেকে দেড় বছরের বড়, স্বপন পাচ মাসের ছোট। তুহিন আর স্বপন আমার দুই ফুপুর ছেলে। আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি, তারা ক্লাস ফোরে। তখনকার এক বৈশাখের ঘটনা।

দুষ্টুমির শুরুটা সব সময় করতো তুহিন। সেটাকে শিল্পের আকার দিতাম। স্বপন ছিল সাহায্যকারী। আমাদের দুষ্টুমির মধ্যে ছিল মৌমাছির চাকে ঢিল ছোড়া, লুকিয়ে বিড়ি খাওয়া, তাশ খেলা ইত্যাদি। তাশ খেলা বলতে একটাই জানতাম, নাম দুরিফিশ। দুই জোকার সব কার্ডের সঙ্গে মেলে, অন্য সব কার্ড জোড়া মেলাতে হতো।

খেলার জন্য বিশেষ একটা স্থান ছিল। আমাদের বাড়িটা অনেক বড়। অনেক ঘরের মধ্যে একটা ছিল মূল উঠানের শেষ প্রান্তে। ওই ঘরে সাধারণত কেউ যেতো না। দোচালা ঘরের বেড়া ছিল বাশের চটার তৈরি, চাল খড়ের।

উপরের দিকে আড়ার সঙ্গে ছিল কাঠ দিয়ে তৈরি মাচা। সেখানে বিভিন্ন মরসুমে কুমড়া, কাঠাল, তরমুজ ইত্যাদি রাখা হতো। ওই মাচাটিই ছিল আমাদের লুকানোর এবং বিভিন্ন অপকর্ম করার প্রধান শেল্টার। তুহিন ও স্বপনের স্কুল ছুটি হতো তিনটার পর আর আমার ছুটি হতো চারটায়। স্কুল থেকে ফিরেই নাকে–মুখে কিছু গুজে তিনজন একত্রিত হতাম। প্রথমে প্ল্যান করতাম কি করবো?

যদি ভালো কিছু না পেতাম তখন বসতাম তাশ নিয়ে। নিঃশব্দে চলতো আমাদের তাশ খেলা। সেদিন ছিল বুধবার। স্কুল থেকে ফিরে তিনজন মিলে কালুকে (পোষা কুকুর) দিয়ে অন্য একটা কুকুরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছিলাম। কালু ওই কুকুরটার দফারফাই করতো কিন্তু চাচা এসে বাগড়া দিলেন। আমাকে একটা থাপ্পড় কালুকে শান্ত করে নিয়ে গেলেন। মনের দুঃখে আমরা তাশ নিয়ে বসলাম এবং খেলায় এতোই মগ্ন হয়ে পড়লাম যে, টেরও পেলাম না পশ্চিম–উত্তর কোণ থেকে কালো মেঘের সমুদ্র পুরো আকাশকে গ্রাস করতে ধেয়ে আসছে।

আমাদের হুশ হলো যখন শো শো শব্দ করে বাতাস শুরু হয়ে গেল। দমকা বাতাসে ঘরের চাল দুলছে। মচমচ কচকচ শব্দ করছে। এক সময় কটকট করে শব্দ করে চালের রশির বাধন কেটে গেল। তুহিন ভয়ে আমাকে জাপটে ধরলো। আমরা তিন ক্ষুদে সন্ত্রাসী ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে মাচা চেপে ধরে শুয়ে পড়লাম। বাতাসের প্রবল তোড়ে আমরাসহ চাল আকাশের দিকে উঠতে লাগলো সেই সঙ্গে পূর্ব দিকে ধাবিত হলো।

আমার মুখ দিয়ে চিৎকার বের হলো না। কিন্তু তুহিন ও স্বপন চিৎকার করে একবার বলে মাগো–বাবাগো বাচাও। একবার বলে আল্লাগো বাচাও। আমি তখন সদ্য শেখা দোয়া ইউনুস দ্রুত আওড়ে চলেছি মনে মনে। আমার বিশ্বাস ছিল এই দোয়া পড়লে ফেরেশতারা এসে আল্লাহর হুকুমে রক্ষা করবেন। এর মধ্যে চাল দুতিনবার পাক খেল। আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেলাম। শক্ত করে ধরে থাকার কারণে মাচা থেকে ছিটকে পড়লাম না। আমরা তিনজনই চোখ বন্ধ করে ছিলাম। অবশ্য পরে আফসোসও করেছি। চোখ খোলা থাকলে মাটি থেকে কতো উপরে উঠেছিলাম দেখতে পেতাম। চোখ খোলা রাখার মতো বুদ্ধি বা সাহস কোনোটাই তখন ছিল না।

এক সময় ঝড় থেমে গেল। কিন্তু প্রবল বর্ষণ চলতে থাকলো। ঘণ্টাখানেক পর বৃষ্টিও থেমে গেল। আমরা নিজেদের আবিষ্কার করলাম বড় একটা কাঠাল গাছের ওপর। চালের চাপে দুই একটা ছোট ডাল ভেঙেছে তবে ভদ্রভাবে চালটা আশ্রয় নিয়েছে মোটা দুটি ডালের ওপর। নিচে নেমে প্রথমে জায়গাটা চিনতে পারলাম না।

স্বপন এক সময় বললো, এটা আমাদের গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে চাদপুরের মাঠ।

কালবৈশাখী ঝড় আমাদের তিন মাইলেরও বেশি আকাশ ভ্রমণ করিয়ে এখানে এনেছে বুঝতে পেরে কাপড় নষ্ট হওয়ার দশা। ওই ঘোর সন্ধ্যায় কিভাবে আমরা বাড়ি ফিরেছিলাম সেটাও কম ইন্টারেস্টিং নয়। তবে তা লিখছি না। বাড়িতে এসে সব বলার পর বাবার হাতে ধোলাই খেতে গিয়েও কোনো রকমে বাচলাম। আমাদের ওই ঘর আবার আগের মতো করে তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে আমি আর স্বপন পরেও তাশ খেলেছি। কিন্তু তুহিনকে আর মাচার ওপর ওঠাতে পারিনি কোনোদিন।

আমার ত্রিশ বছর জীবনে এখনো প্লেনে ওঠার ভাগ্য হয়নি আর হবে কি না তাও জানি না। তবে যদি চড়ি সেটা হবে আমার দ্বিতীয় আকাশ ভ্রমণ। প্রথমটা ব্যতিক্রমী হলেও আকাশ ভ্রমণ তো বটে।

পাগলা, নারায়ণগঞ্জ থেকে

ইউমে

লু

লিখতে বসে ভাবছি কি লিখবো? আমার তো কোনো ইউমে (স্বপ্ন) ছিল না প্লেনে চড়ার। তারপরও আমি এখন প্রবাসী। সুতরাং প্লেনে চড়তেই হচ্ছে। যতোবারই দেশে আসা-যাওয়া করি খুব ভয় হয় মেঘের ওপর ভাসতে, কারণ আল্লাহ না করুক কিছু একটা হলে কারো রক্ষা নেই। তাই সব সময় মনে মনে দোয়া পড়তাম আর চাইতাম আল্লাহ যেনো আমাদের সুন্দর ও সুস্থভাবে পৌছিয়ে দেয়।

আল্লাহর অশেষ রহমতে এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মতোই হলো। কয়েক মাস পর দেশে যাবো ভাবছি। শুধু চিন্তা একটাই, আমার বড় মেয়েটাকে নিয়ে। ওর প্লেনে চড়া খুব অপছন্দ।

দেশে যাওয়ার কথা বললে বলে, আম্মু চলো আমরা বাংলাদেশে পাপার গাড়িতে করে যাই।

যদি বলি কেন, তখন আমার মেয়ে বলতো (হিককিঘিরাই) প্লেনে চড়া অপছন্দ।

প্রথমবার দেশে যাওয়ার সময় খুব কান্নাকাটি প্লেনের ভেতর। কারণ অনেকক্ষণ বসে থাকতে হচ্ছে তাই। একসময় বিমান যখন ঢাকায় ল্যান্ড করার জন্য আস্তে আস্তে নিচে নামছে তখন জানালা দিয়ে মেয়েকে দেখাচ্ছিলাম রাতের ঢাকা শহর।

কি সুন্দর লেগেছিল! রাতের আধারে লাইটের আলো এক কথায় চমৎকার। আমার মেয়েও দেখে আনন্দে বলেছিল, *সোগই ঘিরেইনে* (খুব সুন্দর)।

সত্যিই আমার কাছেও খুব ভালো লাগে। সামনে আবার দেখবো তাই দিন গুনছি এখন থেকে। ছোট থাকতে যখন দেখতাম মেঘের ওপর প্লেন ভাসতে তখন একটিবারও আমার মনে স্বপ্ন জাগেনি প্লেনে চড়ার। কারণ আমার সব সময় মনে হতো স্বামী যদি প্রবাসী হয় তাহলে অবশ্যই প্লেনে চড়া হবে, না হলে হবে না।

প্লেনে চড়াটা বিশেষ কোনো শখের মধ্যে ছিল না। এটা ঠিক যতোবারই স্বামী সন্তানসহ আসা-যাওয়া করি ভালো লাগে।

প্রথমবার যখন প্লেনে করে এসেছিলাম তখন খুব ভালো লেগেছিল। দুজন পাশাপাশি বসে গল্প করতে, নতুন এক অনুভূতি সঙ্গে একটু ভয়। সব মিলিয়ে প্রথম প্লেনে চড়ার সময় বা প্রথম ভ্রমণটা ভালো লেগেছে। প্রথম আকাশ ভ্রমণের দিন যদি আমার অজিসানটা একটা ... দিতো। তাহলে আজকে তখনকার অনুভূতিটা দিয়ে সুন্দর একটা রোমান্টিক ভ্রমণ কাহিনী লিখতে পারতাম। অজিসান কেন একবারও একটি ... দিলে না?

ভাবছি আমি ও অজিসান একসঙ্গে প্লেনে করে তাজমহল দেখতে যাবো। আশা করি সেদিন আমার অজিসান একটি ... দেবে।

অজিসান রাগ করো না। অজিসান বলি আর যাই বলি তুমি তো আমারই S.S.S.S.S হোনতনি আতাসিনো S.S.S.S.S।

চিব, জাপান থেকে

টুকরো স্মৃতি

গাজী আ. জব্বার আকতার

এক

খুব সম্ভব ১৯৬৭ কি ১৯৬৮ সালের ঘটনা। তখন ক্লাস থৃ কি ফোরে পড়ি। মামার নিকটতম এক চাচা ঢাকায় চাকরি করতেন। ওই সময় ঢাকার নারিন্দা অভিজাত এলাকায় এক সিলেটি মেয়ে সঙ্গে আমার চাচার বিয়ের কথাবার্তা হয়। মোস্তফা সাহেব বিয়ের ঘটক। তিনি আমাদের গ্রামে এলেন এবং দাদার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে গেলেন। আমাদের গ্রাম থেকে তিনজন বিয়ের বরযাত্রী হিসেবে প্লেনে ঢাকায় গেলেন।

ঢাকা থেকে ফিরে প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন। তিনজনই সম্পর্কে আমার চাচা ও মামা। এ জন্য নাম উল্লেখ করলাম না। তিনজনের দুজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক, অন্যজন আলিমপুর মিল স্কুলের স্কাউট টিচার। তন্মধ্যে আমার প্রধান শিক্ষক প্লেনে বরযাত্রীর মধ্যে ছিলেন। আমরা তখন ছোট। প্লেনে চড়া আমাদের কাছে আকাশ কুসুম স্বপ্ন ছিল। ক্লাসে স্যারকে ঘিরে ধরলাম। স্যার প্লেনে কেমন চড়লেন?

তিনি খুব ভাবগম্ভীরভাবে বললেন, অপূর্ব। তিনি জানালার ধারে বসে দেখেছেন কিভাবে রানওয়েতে প্লেন চলা শুরু করলো, কিভাবে আকাশে উড়লো ইত্যাদি। তারপর বললেন, গাছপালা সবুজ বেষ্টনীর মতো মনে হয়। মেঘনা নদীকে একটা খালের মতো মনে হলো। যশোর থেকে তেইশ মিনিটে তেজগাও এয়ারপোর্টে এসে নামলাম। মামার মামা যিনি স্কাউট টিচার তার প্লেন চড়া বা উচু মহলে ওঠাবসা ছিল।

তিনি আমার আব্বাকে বললেন, ভাইসাহেব, প্লেন যেই রানওয়েতে চলা শুরু করেছে অমনি অমুক (হেড স্যার) বললেন, প্রস্রাব করবো। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্লেন আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি পায়খানা করবো। স্কাউট মামা তখন এয়ারহস্টেসকে ডাকলে হেড স্যার বললেন, আমি মেয়েছেলের সঙ্গে কোথায় যাবো? এ নিয়ে খুব হাসাহাসি হলো কিছুদিন।

দুই

আইন ব্যবসায় এসে খুলনা বারে যোগদান করি। আমার সিনিয়রের কাছে শুনলাম বারের এক প্রবীণ আইনজীবী প্রথম প্লেনে উঠে এয়ারহস্টেস যে নাশতাপানি দিয়েছিলেন তা খাননি এই ভয়ে যে, যদি বেশি দাম দিতে হয়।

তিন

আমার সিনিয়রের সিনিয়র অ্যাডভোকেট শিকদার খুবই রসিক লোক ছিলেন। তার বেয়াই প্লেনে চড়ে হজে গিয়েছিলেন। বেয়াই সহজ সরল লোক। শিকদার সাহেব বললেন, বেয়াই প্লেন কেমন!

বেয়াই উত্তর দিলেন, বড় বাসের মতো তবে দরজা একবার বন্ধ হলে আর খুলবে না, টাকা সব মার যাবে।

আবার শিকদার সাহেব বললেন, আচ্ছা বেয়াই মক্কায় যেতে হলে প্লেনে তো আরব সাগর পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। তা আরব সাগর কেমন দেখলেন?

উত্তরে বেয়াই বললেন, আরব সাগর আর নেই। পানি ঢেউ কিছু নেই। চর পড়ে গেছে বিস্তীর্ণ এলাকা। শুধু বালু ধু ধু করে আরব সাগরের বুকে।

প্লেনে চড়ার সময় সিনিয়র শিকদার সাহেবের বেয়াইর কথা মনে পড়ে বার বার আর হাসি লাগে। আপ্যায়নের সময় প্রবীণের কথা, প্রকৃতির ডাকের সময় হেড স্যারের কথা মানসপটে বার বার ভেসে ওঠে আর ফেলে আসা স্মৃতিময় দিনগুলো পিছু ডাকে।

বরুনা, ডুমুরিয়া, খুলনা থেকে

আগুনের জিন

মোল্যা জামাল উদ্দিন

১৯৬৮ সাল। ওই সময় আমি ক্লাস ফোরের। ছোটবেলার অনেক স্মৃতির মধ্যে বেদনাদায়ক স্মৃতি এ ঘটনা। সময়টা খুব সম্ভব বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাস। আমাদের স্থানীয় বরুণা গ্রামের হাট বসে সপ্তাহে দুদিন শুক্র ও সোমবার। ঘটনাটি ওই হাটবারের যেকোনো একদিন হবে। সেদিন আকাশে বিকালবেলায় ছিল খণ্ড খণ্ড মেঘ। সিদুর রাঙা মেঘের ফাকে বিদায়ী সূর্যের কিরণে সাঝের মায়া আরো মায়াবী রূপ ধারণ করেছিল। সন্ধ্যার পর পরই জোরে বাতাস বইতে শুরু করলো।

আকাশ দেখতে দেখতে কালো মেঘে ছেয়ে গেল। আমি আব্বার সঙ্গে হাটে গেছি এবং দক্ষিণ আকাশে একটা জ্বলন্ত আগুনের কুণ্ডু উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। অন্ধকার রাতে আগুনের কুণ্ডুর ঈষৎ আলোয় বিদ্যুৎ ঝলকানির রেখা হাটের সব মানুষের মধ্যে প্রবাহিত হলো। অবাক বিস্ময়ে সবাই আগুনের কুণ্ডু দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং মন্তব্য করলো, নিশ্চয়ই আগুনের জিন।

এর মধ্যে ঝড়ো হাওয়া শুরু হলো। বাতাসের প্রচণ্ড উত্তাপ এসে গায়ে লাগতে থাকলো। হাটের লোকজন ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি করতে লাগলো। আমি ভয়ে আব্বার সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম এবং সারা রাত ঘুম হলো না। সকালে রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাতের আগুনের কুণ্ডু সম্পর্কে লোকমুখে নানা ভাবে প্রচার হতে লাগলো। এখনকার মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না।

সকাল দশ থেকে এগারটার দিকে জানা গেল, ডুমুরিয়া থানার সলুয়া বিলে অর্থাৎ পাবলার নিচে একটি ইনডিয়ান যাত্রীবাহী প্লেনে আগুন ধরে সব যাত্রী মর্মান্তিকভাবে পুড়ে মারা গেছে। খবর শোনামাত্র উৎসুক জনতা সাইকেলে, রিকশায়, হেটে যে যেভাবে পারলো ঘটনাস্থলে ছুটতে লাগলো।

আমি নিকটতম এক নানার কাছ থেকে সাইকেল চেয়ে আনলাম। কথা হলো আমার বড়ভাই আমাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। বাড়িতে শার্ট আনার জন্য যাওয়ার উপক্রম করছি হঠাৎ বড়ভাই তার সহপাঠী খালেককে দ্রুত সাইকেলে উঠতে ইঙ্গিত করলে আমি জোরে সাইকেল চেপে ধরলাম। অগত্যা বড়ভাই সাইকেল রেখে নিজে বাড়িতে গিয়ে আমার শার্ট আনলো।

সাইকেল চেপে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ঘটনাস্থলে এলাম। দেখি লোকে লোকারণ্য। প্লেনটির ভগ্নাবশেষ ছিটকে পড়ে আছে। যাত্রীদের পোড়া দেহ যেখানে সেখানে পড়ে আছে। সবচেয়ে করুণ দৃশ্য এক মহিলার লাশ ও তার গর্ভস্থ সন্তানের পোড়া লাশ সব দর্শককে অশ্রুসিক্ত করে

তোলে। চারদিক পুলিশ লাল ফ্ল্যাগ দিয়ে দুর্ঘটনা স্থান ঘিরে রেখেছে। ফলে বেশি কাছে যাওয়া হয়নি।

পরদিন খুলনার স্থানীয় জনবার্তা সংবাদপত্রে বিমান দুর্ঘটনার করুণ কাহিনী প্রকাশ পায়। জানা গেল, ইনডিয়ার আগরতলা থেকে যাত্রীবাহী বিমানটি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আকাশসীমা দিয়ে যাচ্ছিলো। পথে এঞ্জিন বিকল হওয়ায় মে-ডে, মে-ডে (May-Day, May-Day) বিপদ বার্তা সংবাদ দিলেও কোনোরূপ উদ্ধার কাজ করা সম্ভব হয়নি। মে-ডে হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিপদ বার্তা যেটা প্লেন অথবা জাহাজ বিপদে পড়লে রেডিওতে বলা হয়।

পাইলট বিলে নামার চেষ্টা করে শেষ রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার আগে প্লেনে আগুন ধরে যায়, যে দৃশ্য আমরা হাটের রাতে দেখেছি। সেই পোড়া লাশের দৃশ্য এবং মহিলা যাত্রীর গর্ভস্থ সন্তানের পোড়া দৃশ্য ভোলার নয়। এমন ঘটনার যেন কখনো পুনরাবৃত্তি না হয় মহান আল্লাহপাকের কাছে এ কামনা করি।

বরুণা, খুলনা থেকে

ঘুসখোর

পলি

বাবার মৃত্যুর খবর শুনে বাংলাদেশে যেমন কষ্ট পেয়ে গিয়েছিলাম তেমনি কষ্ট নিয়ে আসতে হয়েছে।

২২ এপৃল ২০০৪ সালে আমাদের ফ্লাইট ছিল। যখন লাগেজ বুকিং দিতে যাই কাস্টমস অফিসার বললো, আপনাদের লাগেজ ওজন বেশি কিছু কমিয়ে নিয়ে আসুন।

প্রায় পাচ কেজি ওজন কমিয়ে আবার লাইনে দাড়াই। আমাদের সিরিয়াল এলে অফিসার বললো, ওজন তো কমেনি। আপনাদের টিকেট, পাসপোর্ট নিয়ে যান এবং পাসপোর্টের ভেতর আট হাজার টাকা নিয়ে আসুন।

বললাম আমাদের হাতে কোনো বাংলাদেশি টাকা নেই। যা ছিল ছোট ভাইবোন, মা তাদের দিয়ে এসেছি।

তখন বললো, ঠিক আছে বাংলা টাকা না থাকুক ইংলিশ টাকা দিলেই হবে নয়তো ভাইবোনের টাকাগুলো ফেরত নিয়ে আসুন।

বাধ্য হয়ে অপেক্ষায় থাকা ভাইবোনদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে তাদের দিলাম এবং ভেতরে চলে এলাম।

বিমানে ওঠার আগে লাস্ট চেক যখন হবে তখন সেই ঘুসখোর যে আট হাজার খেয়েছে তার সঙ্গী বিষয়টি দেখেছে। হয়তো আগের জনের কাছ থেকে ভাগ পায়নি। সে এগিয়ে এলো। আমরা তিনজন ছিলাম। তিনটি টিকেট থাকায় আমাদের হাতে তিনটি ছোট ব্যাগ। এ ছাড়া আমার ছেলে ছোট হওয়াতে কিছু বাড়তি কাপড় আর খাবারসহ সব মিলিয়ে চার কেজি হবে।

এখন পাশের ঘুসখোর পাচ হাজার টাকা দাবি করলো হাত ব্যাগের ওজন বেশি বলে। ঘুস খাওয়ার একটা কারণ বের করতে হবে, তাই বললো হাত ব্যাগ তিনটা কেন?

আমার স্বামী বললো, বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ চলে যায় টাকা সঙ্গে করে নিয়ে যায় না রেখে যায়। এখন দেখছি আপনাদের জ্বালায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা হাতে রাখতে হবে।

তখন সেই ঘুসখোর কাস্টমস অফিসার বললো, এখন থেকে মনে রাখবেন। টাকা সঙ্গে রাখবেন।

এতো কিছুর পর যখন বুঝলো ঘুস পাওয়া সম্ভব না তখন বললো, আপনারা আর কখনো দেশে আসবেন না।

স্বামী বললো, ঠিক আছে আর আসবো না।

স্বামী কথাটা মেনে নিলেও আমি নেইনি। শুধু বলে এসেছি, বাংলাদেশটা আমাদের, আমরা আসবোই আর বেশি কিছু বলতে পারিনি। কারণ বেশি কিছু বললে অনেক কিছু হতে পারতো, হয়তো বা বলতে পারতাম, আমাদের দেশের বিমানের কাউন্টার ক্লার্ক কাস্টমস অফিসার, ইমিগ্রেশন অফিসার, এয়ারপোর্টের সব সরকারি অফিসারগুলো মানুষকে বিপদে ফেলতে।

কিছু দিন আগে একটি পত্রিকায় পড়লাম চট্টগ্রাম পাচ তারা হোটেলের মালিক বলেছে, বাংলাদেশে ব্যবসা করতে হলে হয়তো বা তারেক জিয়া বা জয় হতে হবে।

তখন বলতে পারতাম আপনাদের মতো ঘুসখোরদের জন্য দেশে আসা বন্ধ করবো কেন দেশটা কি ঘুসখোরদের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে? দরকার পড়লে আপনারা চাকরি ছেড়ে চলে যান। ঘুস খাওয়ার জন্য আপনাদের রাখা হয়নি। রাখা হয়েছে দেশ রক্ষা করার জন্য। দেশ ও দেশের মানুষকে চুষে খাওয়ার জন্য নয়। বলতে পারিনি কারণ আমি তারেক জিয়া বা জয়ের বোন না।

তাই সেদিন যেমন কষ্ট নিয়ে এসেছি এই কষ্ট আমাদের মতো যারা দেশের বাইরে থাকি শতকরা একশ ভাগ এর মধ্যে নিরানব্বই ভাগ যাত্রী এমন কষ্ট নিয়ে আসে। এমন পরিস্থিতিতে কারো আকাশ ভ্রমণ ভালো হতে পারে না। আত্মীয়স্বজন, ভাইবোন, মা, বাবাকে ছেড়ে আসা যেমন কষ্ট দেশ ছেড়ে আসা তেমনি আরো কষ্ট। সব কষ্টের পরও কারো আকাশ ভ্রমণ ভালো হয় কারো কষ্টের হয়। আমাদের মতো যারা দেশের বাইরে থাকে তাদের জন্য সরকার শুধু এয়ারপোর্টে ভেতরে এবং বের হওয়ার সুব্যবস্থা করতো তাহলে প্রত্যেকটা যাত্রীর যাত্রা শুভ হতো।

বাবা পাচ বছর আগেও একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। আমরা কখনো স্বচ্ছলভাবে চলতে পারিনি কারণ বাবা ঘুস খাননি। সৎ থেকেছেন আর তখন সৎ থাকার কারণে এখন সৎ অফিসারের মেয়ে হয়ে অসৎ অফিসারকে ঘুস দিতে হয়েছে।

সব যুট ঝামেলা মিটিয়ে প্লেন যখন আকাশে তখন হেডফোনে দেশের গান শুনলে বিদায়বেলা কি যে কষ্ট চোখে পানি ধরে রাখা যায় না।

বেলজিয়াম থেকে

হারানো প্রেম

ইউনুস

দুবাই এয়ারপোর্টের ডিউটি ফৃ শপে কেনাকাটার জন্য হাসান ঘোরাফেরা করছে। এখানে দাম একটু বেশি হলেও ওজনের টাকা দিতে হয় না। বৌয়ের চাহিদা মতো জিনিস কেনা হয়েছে। আরো কিছু কিনবে কি না মনে মনে ভাবছে।

হঠাৎ পাশ থেকে মহিলার কণ্ঠ, হাসানভাই কেমন আছেন?

হাসান মহিলার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে। সে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। সংবিৎ ফিরে বললো, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো তানিয়া?

ভালো আছি, চলুন বাইরে গিয়ে বসি।

লোকে লোকারণ্য এয়ারপোর্ট। কয়েক দেশ থেকে ট্রানজিট ফ্লাইট এসেছে। এখান থেকেই আসল গন্তব্যে যাবে। ঢাকা, মুম্বাই, করাচি, কলম্বো, ম্যানিলা। বসার জায়গা পাওয়া সমস্যা। ছোট জায়গাতেই দুজনে বসে পড়লো। দুজন দুজনকে দেখছে। দুজনেরই মনের ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। দুজনের শরীরে মৃদু কম্পন হচ্ছে।

হাসান জিজ্ঞাসা করলো, এখানে কিভাবে? কোথায় যাচ্ছো?

দেশে যাচ্ছি, এমিরেটস ফ্লাইটে, তানিয়া বললো। টরন্টো, নিউ ইয়র্ক, দুবাই হয়ে ঢাকা।

আমিও এমিরেটস–এ যাচ্ছি, হাসান বললো। দাম্মাম, দুবাই হয়ে ঢাকা ।

আমি অনেকক্ষণ আপনাকে ফলো করেছি। যদি আপনি না হন তবে লজ্জা পাবো। পরে ভাবলাম যা হয় হবে। তানিয়া বললো, অনেক বছর পর দেখা।

হাসান বললো, প্রায় পনেরো বছর পর তোমাকে দেখলাম ।

কফি খাবেন? হাসানকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তানিয়া কফি আনতে চলে গেল। হাসান ভাবছে সেই সহজ শান্ত মেয়েটির কতো পরিবর্তন হয়েছে।

ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী ফার্মগেট ওভারবৃজে বিমানের বিজ্ঞাপনটি দেখে হাসান ভাবতো কবে বিমানে চড়ে স্বপ্ন পূরণ হবে। একদিন চাকরি নিয়ে প্রবাসে চলে এলো। কয়েক ঘণ্টায় হাজার হাজার মাইল পার হয়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। আসলেই বিমানের বিজ্ঞাপনটি যথার্থ।

তানিয়া কাগজের কাপে দুই কাপ স্টারবাক কফি নিয়ে এসেছে।

তোমাকে খুব সুন্দরী লাগছে, এখনো চমৎকার ফিগার রেখেছো।

শুনেছি আপনার স্ত্রীও সুন্দরী। আপনিও বদলাননি।

তোমার কথা বলো। ছেলেমেয়ে কয়টি? কি করছো কানাডাতে।

আগে চাকরি করতাম, এখন ব্যবসা করছি, তানিয়া বললো। এক ছেলে, এক মেয়ে।

আমি এখনো চাকরি করছি আর একটি রিক্রুটিং এজেন্সির ওভারসিজ রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে কাজ করি। দুই ছেলে। হাসান বললো।

দুজনে কথা বলেই যাচ্ছে, কেউ থামছে না। প্লেন ছাড়ার সময় হয়ে আসছে মাইকে বলে যাচ্ছে। প্লেনে ওঠার সময় দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল। এক সঙ্গে বসতে পারবে না। সিট নাম্বারের জন্য দূরে বসতে হবে। হাসান 23A আর তানিয়া 28B। হাসান ইনডিয়ান এয়ারহস্টেসকে বললো, তিনি আমার আত্মীয়া। দুজনে একত্রে বসতে পারলে ভালো হতো। প্লিজ, একটা ব্যবস্থা করুন।

ভাগ্য ভালো, তানিয়ার পাশের সিটের যাত্রী এখনো আসেনি। এয়ারহস্টেস মুচকি হেসে হাসানকে তানিয়ার পাশের সিটে বসার সুযোগ করে দিল। হাসান তাকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

তানিয়ার মুখ হাসিতে ঝলমল করছে। ভাগ্য আরো সুপ্রসন্ন হাসানের সিটের পাশে দশ বারো বছরের এক ছেলে। তানিয়া 28A, হাসান 28B ছেলেটি, 28C এবং ছেলেটির বাবা লেইনের পরে 28D। প্লেন ভেসে চলছে ঢাকার উদ্দেশে।

হাসান বললো, তানিয়া আমার খুব ভালো লাগছে।

তানিয়া বললো, আমারও খুব ভালো লাগছে আবার কাদতেও ইচ্ছা করছে। আপনি অনেক কষ্ট দিয়েছেন।

আমি যে তোমাকে অনেক ভালোবাসতাম এবং আজো ভালোবাসি তা তুমি জানো।

আপনি তো ভীরু, মুখফুটে কখনো এ কথাটি বলেছেন? তবে বুঝতাম আমাকে ভালোবাসেন। বিদেশে গিয়ে অনেক চিঠি লিখেছেন কিন্তু কোনো চিঠিতে একবারও লেখেননি এই কথাটি।

হালকা রাগে অভিমানের সুরে কথাগুলো বললো তানিয়া।

তোমার লেখায় বুঝতাম ভালোবাসার কথা। আমার আত্মবিশ্বাস ছিল তোমাকে বিয়ে করবো। কিন্তু তা হলো না। মনের কথা মনেই রয়ে গেল। এক অর্থে ভালোই হয়েছে। আমাকে বিয়ে করলে তুমি কানাডায় যেতে পারতে না।

টাকা পয়সার সঙ্গে ভালোবাসার তুলনা হয় না। মনের সুখই বড় সুখ, তানিয়া বললো।

এয়ারহস্টেস ড্রিংক সার্ভ করছে।

হাসান বললো, অরেঞ্জ জুস প্লিজ।

তানিয়া হাসানের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

তানিয়া জিজ্ঞাসা করলো, এমিরেটস ফ্লাইটে কতো ধরনের ড্রিংক থাকতে অরেঞ্জ জুস কেন?

ওগুলোর অভ্যাস করিনি।

আপনি আসলেই খুব ভালো মানুষ।

তানিয়া সত্যি করে একটা কথা বলবে, হাসান জিজ্ঞাসা করলো। তুমি কি আজো আমাকে ভালোবাসো?

অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কখনো নীরবে নিভৃতে আপনাকে খুব মনে করি। আপনি সুন্দরী বউ নিয়ে আনন্দেই আছেন, তাই না?

তানিয়া শোনো, আমাকে তুমি করে বললে ভালো লাগবে। আপনির চেয়ে তুমি বেশি আন্তরিক।

ঠিক আছে, তুমি করেই বলবো।

আই লাভ ইউ তানিয়া।

হাসানের কানের কাছে মুখ এনে আস্তে করে তানিয়া বললো, আমিও তোমাকে ভালোবাসি।

তানিয়া, প্লেনটি কতো হাজার ফুট ওপর দিয়ে যাচ্ছে?

কেন?

তোমাকে সেই কিশোরী বেলা থেকে ভালোবাসি। ঢাকার রমনা পার্কে গিয়ে বা রিকশায় পাশাপাশি বসে বলতে পারিনি এই কথাটি। আজ হাজার ফুট উচুতে প্লেনে পাশাপাশি বসে দুজনেই ভালোবাসার কথাটি বললাম। খাবার পরিবেশন করা হচ্ছে। খাবারের পর লাইট অফ করে মুভি দেখানো হবে। হাসানের মনে হচ্ছে সময় খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে।

তানিয়া জিজ্ঞাসা করলো, তুমি খাচ্ছো না কেন?

আমার মন আনন্দে ভরপুর তাই খেতে ইচ্ছা করছে না।

অনেকদিন পর তানিয়ার সেই সুন্দর হাসিতে হাসান পুলকিত হলো।

তুমি সেই আগের মতোই আছে বোকা কোথাকার তানিয়া আস্তে কথাটি বললো।

হাসান বললো, এই বিশেষণটি মাঝে মধ্যে বৌও আমাকে দেয়।

তানিয়া, অতীতের অনেক স্মৃতি বার বার মনে পড়ছে যদিও ভালোবাসার কথা তখন বলা হয়নি।

তোমার চোখের ভাষাতে বুঝতাম আমাকে ভালোবাসো। শোনো, কিছুদিন আগে টরন্টোতে একা গাড়ি চালাচ্ছি, পুরনো গান শুনছি। গানটি শুনে কেন জানি তোমার কথা মনে পড়ে গেল। সম্ভবত শ্যামল মিত্রের গাওয়া

চোখে চোখে বলে গেছি মনেরই কথা

হায় হায় প্রিয়সখা বুঝলে না তা

মিটিল না দূর আশা

মনেই রয়ে গেল মনেরই ব্যথা।

তানিয়া জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা তোমারও কি কখনো আমাকে মনে পড়ে? প্রথম প্রেমের স্মৃতি ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? তোমার হাত এদিকে দাও তো একটু ধরবো হাসান বললো।

ইশ, পরের বৌয়ের হাত ধরবে কেন? ঠোট বাকা করে তানিয়া বললো।

হাসান তানিয়ার হাতে চুমু দিল।

স্থল পথে যা পারিনি আজ আকাশ পথে তাই করতে পারলাম। তানিয়া কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারলো না। আবহাওয়া খারাপের জন্য প্লেনটি একবার নিচে আবার উপরে উড়ছে।

লম্বা জার্নিতে আমার পা ব্যথা করছে আর হালকা মাথা ব্যথা করছে।

হাসান তানিয়ার কপালে হাত রেখে আলতো করে মাথা টিপে দিচ্ছে। একটা পেইন কিলার ট্যাবলেট খেয়ে লাল চা অথবা ব্ল্যাক কফি খাও মাথাব্যথা চলে যাবে।

প্লেনটি পাকিস্তান পার হয়ে ইনডিয়ার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। হাসান তানিয়াকে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা প্লেনটি কি খুব দ্রুত যাচ্ছে?

তানিয়া বললো, সেটা তোমার মনের ভুল। প্লেন তার গতিতে ঠিকই চলছে।

তানিয়া, স্বামী সংসার নিয়ে কানাডাতে কেমন আছো?

এমনিতে ভালোই আছি, সবাই বলে ভালো আছি। কিন্তু মনে সুখ নেই। মনের সুখই বড় সুখ। সবার ভাগ্যে সব কিছু হয় না। অনেক বার ভেবেছি এবং এখনো ভাবছি তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে বেশি সুখি হতাম। আমার মনের অতৃপ্ত ভালোবাসা সারা জীবন অপূর্ণই থেকে যাবে।

তুমি আমার স্ত্রী হলে আমিও বেশি সুখী হতাম, সবই ভাগ্য।

তানিয়া হাসানের কাছে এসে বললো, আজকের এই স্মৃতিকথা সারা জীবন আমার মনে থাকবে।

হাসান তানিয়ার কানের কাছে মুখ এনে বললো, একটু আদর দাও না ডারলিং।

কথাটি তাহলে বলতে পারলে, আমি তো ভেবেছিলাম অন্য কিছু।

হাসান তানিয়াকে আরো কাছে এনে ঠোটে ঠোট রাখলো।

তুমি যে কি করো, থাক আর কষ্ট বাড়াতে চাই না।

আমার খুব ভালো লাগছে। মন চায় লতার মতো তোমাকে জড়িয়ে ধরে রাখি।

তোমার এই মধুমাখা কথাগুলো আমার মন আরো দুর্বল করে দিচ্ছে।

প্লেন ইনডিয়া পার হয়ে বাংলাদেশ সীমানায় এসে গেছে। বাংলাদেশের নাম বলাতেই দুজনে নড়েচড়ে বসলো।

হাসান তানিয়ার কপালে চুমু দিয়ে বললো, যে কয়েকদিন তুমি দেশে থাকবে, যখনই ডাকবে এই অধম এসে হাজির হবে।

আধা ঘণ্টা পর প্লেন ল্যান্ড করবে। সিটবেল্ট বাধার জন্য তানিয়া হাসানের কপালে চুমু না দিয়ে হাতের তালুতে চুমু দিয়ে বললো, তোমাকে আমার হৃদয়ের ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে দিলাম।

প্লেনটি ধীরে ধীরে জিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের দিকে নেমে যাচ্ছে।

সউদি আরব থেকে

শুধু থিওরি

মোহাম্মদ আল-এমরান

আমি একজন যন্ত্র প্রকৌশলী এবং আমার পঠিত বিষয় ছিল অটোমবিল ইনজিনিয়ারিং যা ফোর্থ ইয়ারের একটি বিশাল সাবজেক্ট ডিগ্রি অর্জন করতে আমাকে বিভিন্ন রকম এঞ্জিন এবং থিওরি পড়তে হতো যেগুলোর অনেকই এরোপ্লেন রিলেটেড। যেমন জেট প্রপালশন, রকেট প্রপালশন, সাবমেরিন, সি-প্লেন, এয়ার ফয়েল থিওরি, ড্র্যাগ অ্যান্ড লিফট ফোর্স অর্থাৎ এঞ্জিনের কার্যক্রম থেকে শুরু করে কিভাবে কোন ফোর্স অ্যাপ্লাই করে প্লেন উপরে ওঠে এবং কোন ফোর্সের কারিসমায় ল্যান্ড করে সবই জানা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ছাত্র জীবনে আমি প্র্যাক্টিকালি প্লেনে ওঠা তো দূরের কথা, কাছ থেকে প্লেন দেখিইনি।

অবশেষে আমার সে আশা পূর্ণ হলো জীবনের তিন নাম্বার চাকরি মিল্কভিটায় এসে। নতুন একটা প্লান্টের তিন সপ্তাহের ট্রেনিংয়ের জন্য আমাকে ইওরোপিয়ান কান্ট্রি ডেনমার্ক ও ফ্রান্সে পাঠানো হলো।

পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসা (সিনজান স্টেট, যে ভিসা দিয়ে বৃটেন ব্যতীত অন্য উন্নত ইওরোপিয়ান চোদ্দ অথবা চব্বিশটি দেশে ভ্রমণ করা যায়) কনফার্ম হবার পর অবশেষে এলো সে মাহেন্দ্রক্ষণ। উত্তরায় ভায়রা ভাইয়ের বাসায় রাতে আবেগ ও উত্তেজনায় ঘুম হলো না।

বৃটিশ এয়ারে (বিএ-ওয়ান ফোর ফোর) টিকেট হওয়ার কারণে ভোরে উঠতে হলো। কেননা প্লেন ছাড়ার সময় সকাল আটটায় হলেও চেক ইন ছয়টায়।

বিদায়বেলায় আমার গিন্নির মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না যদিও সে কাদতে পারেনি শেষে দুলাভাই ক্ষ্যাপায় এ ভয়ে। যথাসময়ে এয়ারপোর্টে পৌছালাম। এজিএম (টেকনিকাল) স্যার যিনি বর্তমানে জিএম, সঙ্গে থাকায় কোনো অসুবিধা হলো না। কেননা তিনি চল্লিশটিরও অধিক দেশে এর আগে ভ্রমণ করেছেন।

চেক ইন করলাম। কিছুক্ষণ পর প্লেনে ওঠার ঘোষণা হলো। বোর্ডিং পাস দেখিয়ে নির্দিষ্ট ওয়েতে গিয়ে প্লেনে ওঠে বসলাম। নতুন হিসেবে আমাকে চেক ইনের সময়ই উল্ডোতে সিট দেয়া হয়েছিল। আমার সিট থেকে পরিষ্কার ককপিট দেখা যাচ্ছিল এবং তখনই আমার সমস্ত এঞ্জিন এবং ড্র্যাগ ও লিফট ফোর্সের কথা মনে হচ্ছিল। কেমন যেন মন উদাস হয়ে যাচ্ছিল, আমি কখনো দেশে ফিরতে পারবো না।

কিছুক্ষণ পর মাইক্রোফোনে বাংলা ও ইংরেজিতে মেসেজ দেয়া হলো, অল্প সময়ের মধ্যে আমরা উড়তে যাচ্ছি, দয়া করে সবার সিটবেল্ট বেধে নিন।

সিটবেল্ট বেধে নিলাম, প্লেন প্রথমে একটু নড়ে উঠলো এবং আস্তে চলতে শুরু করলো।

কিছু সময়ের পর দিক চেঞ্জ করে প্লেন বিকট শব্দে হাই স্পিডে রানওয়ে দিয়ে ছুটতে লাগলো। মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলাম আমরা আর মাটিতে নেই।

প্লেন উপরে উঠছে তো উঠছেই যেন ওঠার শেষ নেই। ঘোর কাটার পর দেখতে পেলাম প্রতিটি যাত্রীর জন্য একটি করে টিভি স্ক্রন এবং সিটের হাতলের সঙ্গে রিমোট কন্ট্রোল। প্রায় বিশটির মতো চ্যানেল। রেকর্ডকৃত খবরসহ হিন্দি মুভি, ইংলিশ মুভি, কার্টুন, জিওগ্রাফিক এবং একটি প্লেনের চলমান ডাটাসমৃদ্ধ চ্যানেল যেখান থেকে প্রতি তিন চার মিনিট পর পর স্পিড, অ্যালটিটিউড, একসপেকটেড রিচিং টাইম, সারাউন্ডিং এয়ার টেম্পারেচার ইত্যাদি ডাটা পাওয়া যায়।

পরে এমন ডাটা দেখতে পেলাম যথাক্রমে সাতশ পঞ্চাশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা, পয়ত্রিশ হাজার ফিট, সেভারেল টাইম ডিপেন্ড আপন ডিসট্যান্স চল্লিশ সেন্টিগ্রেড। টয়লেটের কমোড ক্লিন এয়ার ভ্যাকুয়াম সিস্টেমে।

সব কিছু স্বপ্নের দেশের মতো মনে হতে লাগলো। নাশতা, ড্রিংকস, লাঞ্চ আবার নাশতা ঠিক সময়ে হয়ে গেল, কিভাবে সময় যাচ্ছে যেন বুঝতেই পারছি না।

ফিক্সড উইন্ডো দিয়ে নিচের পাহাড়কে একদিকে ঢালু মনে হচ্ছিল, সমুদ্রের জাহাজের অবস্থান শুধু প্রপেলারের ধাক্কায় পানির ঘূর্ণনের ফলে যে শাদা বুদবুদের সৃষ্টি হয় এর জন্য বোঝা যাচ্ছিল। মোট এগারো ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিট পর লন্ডনের হিথরোতে নেমে আবার প্লেন চেঞ্জ করে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে পৌছালাম। লাগেজ কালেক্ট করতে গিয়ে দেখলাম আমার লাগেজটি ভেঙে গেছে।

আমার ট্রেনিং কোঅর্ডিনেটর রিসিভ করার জন্য এয়ারপোর্টেই ছিলেন। তাকে বলতেই তিনি লাগেজ কমপ্লেইন সেন্টারে বিষয়টি জানালেন এবং তারা ছবি থেকে আমাকে একই সাইজের স্যামসনাইট ব্র্যান্ডের একটি লাগেজ পছন্দ করতে বললেন এবং এও বললেন, সাত দিনের মধ্যে ঠিকানা মোতাবেক ওই লাগেজ পৌছে যাবে।

এরপর মার্স্ক এয়ারলাইন্সে কোনো বিপত্তি ছাড়াই ফ্রান্স ঘুরে আবার এলাম ডেনমার্ক। দশ দিনেও লাগেজ না পৌছালে কোঅর্ডিনেটর ডায়ালগ দিলেন, *বৃটিশ ইজ অলওয়েজ বৃটিশ*।

যদিও আনলাকি থার্টিনথ ডেতে লাগেজটি হাতে পেয়ে বরং খুশিই হলাম। কেননা সেটি আমার লাগেজের চেয়ে অনেক সুন্দর এবং মজবুত ছিল। ফেরার সময় একাই ফিরলাম, কোনো সমস্যা হলো না।

এ ট্রিপ থেকে বুঝলাম টেকনলজি এবং সার্বিক উন্নতিতে পশ্চিমিরা কোথায় আর আমরা কোথায় আছি?

আমরা শুধু এরোফয়েল থিওরি মুখস্থ করছি পাস করার জন্য আর তারা সেই একই থিওরি পড়ে থিসিস করে সবাইকে শূন্যে উড়িয়ে মুহূর্তে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌছে দিচ্ছে। কবে আমরা তাদের মতো নবযুগে প্রবেশ করবো?

মিল্কভিটা, বাঘাবাড়ীঘাট
সিরাজগঞ্জ থেকে

ঢাকা পার্থ ও লন্ডন

মিতুল খান

এমিরেটসের কানেকটিং ফ্লাইট। সাত কি আট ঘণ্টার যাত্রাপথ। দুবাই থেকে হিথরো। এই দীর্ঘ সময়ে টিভি স্ক্রনে ভেসে ওঠা ইনডিয়া-ইংল্যান্ড খেলার ফলাফল ও উত্তেজনা, সহযাত্রীদের ক্লান্তিকর চাহনি আর এয়ারহস্টেসদের ব্যস্ত আসা-যাওয়া কোনো কিছুতেই যেন প্রাণ নেই।

হয়তো আছে। আমি খুজে পাচ্ছি না। মেঘের রাজ্যটাতে যে একটু চোখ মেলবো, তারও উপায় নেই। জানালার পাশের জায়গাটি দখল করে বসে আছেন অশীতিপর এক দম্পতি। কেন এমন হয়? বোর্ডিং পাস নেয়ার আগে খুব চাইছিলাম, সিটটা যেন জানালার পাশে হয়। হলো না। কি আর করা।

তারচেয়ে বরং ঘুমানোর চেষ্টা করা যাক। অকস্মাৎ আধো ঘুম-আধো জাগরণেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঢাকা শহর। স্মৃতির নগরী। ওটা ছেড়ে এসেছি ছয় ঘণ্টাও হয়নি। অথচ কি ম্যাগনেটিক! ঠিকই সে চলে এসেছে পেছন পেছন। কলাভবন, টিএসসি, শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেট, বেইলি রোডের নাটকপাড়া আর সাতমসজিদ রোডের আমেরিকান সফট আইসক্রিম। ফেলে আসা জীবন। ফেলে আসা কোলাহল।

রানওয়ের বুক ছুয়ে ডানা মেলে উড়তে থাকে এমিরেটস নামের বিশালায়তন পাখিটা। মনে পড়ে, অর্ধযুগ আগের কোনো একদিন আমি ও অলি একই আকাশযানে চেপে পাড়ি জমিয়েছিলাম বৃটেনের পথে। কেমন ছিল সে অভিজ্ঞতা?

অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও মনে করতে পারলাম না। বোধহয় ধুলো জমতে শুরু করেছে স্মৃতিতে। স্মৃতির ধুলা। যদিও কোথায় যেন পড়েছিলাম, প্রথম বিদেশ যাত্রা প্রথম আলিঙ্গনের মতোই রোমাঞ্চকর। প্লেনের আচমকা ঝাকুনিতে ঘুম কেটে যায়। লেদারের মোটা জ্যাকেট গায়ে চাপানোর অপরাধে শরীরের ঘামটুকু যে কখন বৃষ্টি হয়ে ঝরতে শুরু করেছে বুঝিনি। একই সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপার, নরম একটা ট্রাউজার্স পরায় দুই পা যেন জমে বরফ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। একই দেহে এতো রূপ!

নিজেকে ব্যস্ত রাখতে থাকি ঠাণ্ডা ও গরমের ভারসাম্য তৈরির মাধ্যমে। জাপান দেশীয় আকাশকন্যা আমার কাছে এসে সিম্ফনির মতো আওয়াজ করে জানতে চান, চিকেন না ল্যাম্ব - কোনটা খেতে চাই?

বার্ড ফ্লু আতঙ্ক আমাকে খুব একটা বিচলিত করতে পারেনি। সাহস করে বলেই ফেললাম, চিকেন, প্লিজ।

আমার সামনে খাবারের পসরা সাজিয়ে এক গাল হেসে বিদায় নেন তিনি। খাবার সামনে নিয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া *কাটে না সময় আর কিছুতেই,* তখন লাঞ্চ পর্ব শুরু করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এটা কি ঠিক লাঞ্চ আওয়ার? স্থানীয় সময় দুপুর দুটো। আমার ঘড়িতে যদিও সময় বিকাল পাচটা পেরিয়ে ছয়টা অভিমুখে যাত্রা করেছে। বাংলাদেশ সময়। মন চাইছে আরো কিছুক্ষণ ফেলে আসা সময়কে ধরে রাখি। ভাবনায় চলে যাই আজিজ সুপার মার্কেটের দোতলায়।

হায়দারভাইয়ের রেস্তোরায় এমনই মায়াবী বিকেলে আমার চারপাশে বসে আছে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা। অনেকটা গোল হয়ে। চা চলছে কাপের পর কাপ, বিরতিহীন। কেননা *টা* খাওয়ার পয়সা নেই। তাতে অবশ্য তাদের কোনো অনুযোগও নেই। তারা এসে

আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে গল্প করে যেতো। চিন্তায় ছেদ পড়লো পাশের ছিটের ভদ্রলোকের বিনম্র আহ্বানে। ডায়েট কোকের সঙ্গে রেড ওয়াইনের টক্কর (চিয়ার্স) কি মানায়?

তবুও লোকটাকে *না* করতে পারলাম না। আকাশকন্যার মতো কৃত্রিম হেসে কোমল পানীয় হাতে নিয়ে বললাম, চিয়ার্স।

তিনি জানতে চান আমি ইনডিয়ান কি না। তাকে জানালাম, আমি বাংলাদেশের নাগরিক। শুনেই লোকটার চোখ ঝলমল করে ওঠে। তাকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে দেখছি নিজেই হতভম্ব হয়ে গেলাম। *জঙ্গি নেতা আবদুর রহমান ও বাংলাভাই ধরা পড়েছে।* উচ্ছ্বাস নিয়ে তিনি বলতে থাকেন। সংবাদটা আমার অজানা নয়। তবু বিষয়টাকে গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করতে থাকি। নিশ্চয় আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় খবরটি ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে।

লোকটাকে নিয়ে কৌতূহল বোধ করতে থাকি। পুরো নাম ডেভ ব্রায়ান। অবসর জীবন যাপন করছেন। ভদ্রলোক ইংলিশ। স্ত্রী ইনডিয়ান বংশোদ্ভূত বৃটিশ। ফিরছেন অস্ট্রেলিয়ার পার্থ থেকে। তাদের সন্তান সেখানে কাজ করে। কৌতূহল বোধহয় এক সংক্রামক ব্যাধি। আমার কৌতূহল দেখে ব্রায়ানও নড়েচড়ে বসেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। জানতে চান জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি প্রসঙ্গেও।

তাকে বলি, দেখুন, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ শান্তিপ্রিয়। আমার কাছে কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবু এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

ব্রায়ান খুব চালাক। তিনি প্রশ্ন করেন, তোমাদের দেশের পলিটিশিয়ানরা তো নিশ্চয়ই বাকি দুই শতাংশের মধ্যে পড়ে?

হেসে ফেলি। কোনো উত্তর দিই না। সব প্রশ্নের কি উত্তর হয়? প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ব্রায়ানের কাছে বৃটেনের রাজনীতি সম্পর্কে জানতে চাই।

তিনি বলেন, যেহেতু আমি লেবার পার্টির সমর্থক, কাজেই মতামতও হবে পক্ষপাতদুষ্ট।

তার সরলতায় মুগ্ধ হই। বাংলাদেশের কোনো আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপির সমর্থক কি কোনোদিন স্বীকার করেছে সে পক্ষপাতদুষ্ট?

ব্লেয়ারের সংস্কার কর্মসূচির যৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলে চলেছেন মি. ব্রায়ান। সেসবের অনেক কিছুর সঙ্গেই অবশ্য সহমত পোষণ করি না। তাতে কি। বলুক না লোকটা। তার বিশ্বাস আর ভালোলাগার যে জায়গাটিতে ব্লেয়ার আর লেবার পার্টি বসে আছে সেখানে ঝামেলা পাকিয়ে কি লাভ?

ব্রায়ানের নিরবচ্ছিন্ন বক্তৃতার মাঝখানেই তার স্ত্রী হিন্দিতে কিছু একটা বলতে থাকেন আমার উদ্দেশে। *হিন্দি বুঝি না* এই নির্মম সত্যটি তাকে জানাতেই তিনি ইংরেজিতে জানতে চান, কখনো অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েছি কি না।

যাইনি কখনো এটি শোনার পরই শুরু হলো মিসেস ব্রায়ান পর্ব। মহিলার গল্প বলার ধরন বেশ আপন আপন। বাংলাদেশের বৃদ্ধারা যেমন পানের বাটা নিয়ে আয়েশ করে গল্পের পসরা সাজান, অনেকটা সে রকম। বলতে থাকেন তিনি। তার সন্তান যেখানে কাজ করে, পার্থ, সেটি নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর শহরগুলোর একটি। চিরসন্তের নগরী যেন। জীবন যেখানে এক যাপিত বিস্ময়। খুব ছোটবেলায় রূপকথার গল্প শুনে যে রকম পুলকিত হতাম, আজো সে রকম হলো।

বহুকাল পর। পার্থে কোনোদিন যাওয়া হবে কি না কে জানে। না হোক তবুও আজ থেকে বিশ্বাস করবো পার্থ পৃথিবীর সুন্দর শহর। কেননা এক স্নেহময়ী মা তার সন্তানের আবাসকে, চারপাশকে গভীর মমতার অপার্থিব এক সুন্দরের মধ্যে আবিষ্কার করে চলেছেন। সাত কি আট ঘণ্টার মধ্যেই আরো সুন্দর, পৃথিবীর সুন্দরতম শহর লন্ডনে পৌছে যাবো।

আমার মাও নিশ্চয়ই দেশে বসে এমনটি ভাবছিলেন। ব্যবসার কাজে এসে সতেরো দিন পর কাজ শেষে আবার দেশে ফিরে যাই। দেশে বসে এখন ভাবি, বাংলাদেশে কবে এমন সুন্দর শহর হবে।

মানিকগঞ্জ থেকে

আকাশট্রাক ও আকাশ ভেলা

কাজী এসএম সায়েম

সাধারণত রাস্তায় চলে *ট্রাক* আর জলে অর্থাৎ নদী, খাল-বিলে চলে *ভেলা*। ছোটবেলায় চার পাচটি কলাগাছ এক সঙ্গে করে দুই পাশে পেট বরাবর বাশের কঞ্চি ঢুকিয়ে ভেলা বানিয়েছি এবং আমার মতো কয়েকজনে মিলে পুকুরে ভাসিয়েছি। আজ আপনাদের শোনাবো আকাশের ট্রাক ও ভেলার কাহিনী। সেই সঙ্গে আকাশে *চান্দের জিপ* চালানোর কাহিনী ফাও হিসেবে মিলবে।

বাবা বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা। আমাদের আকাশে ওড়ার শখ তিনিই পূরণ করেছেন। বিমানবাহিনীতে মাল পরিবহনের জন্য যে বিমান ব্যবহার করা হয় তার নাম এন-থার্টি টু। কিন্তু বাংলাদেশ বিধায় তাতে মানুষও পরিবহন করা হয়। এতে শুধু বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা ও বিমান সেনারা এবং তাদের পরিবার উঠতে পারতেন। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর জন্য বাবাকে অনেক অনুরোধের পর একবার চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার ব্যবস্থা করলেন সেই বিমানে। আমরা তখন চট্টগ্রামে থাকি।

প্রথম বিমানে উঠবো, এ ভাবনায় সারা রাত যেন চোখের পাতা এক করতে পারছিলাম না। চাচা-মামারা বিদেশ থেকে আসার পর বিমানে চড়ার কতো রকম গল্প শুনতাম। সুন্দরী এয়ারহস্টেসরা সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করেন। এমন আরামদায়ক সিট যেন পিঠ ছোয়ালেই ঘুম এসে যায়। মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে বেড়ানোর উত্তেজনা, এসব মনের মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করতে করতে রাত ভোর করলাম। পরদিন সকাল এগারোটায় ফ্লাইট। সকালে নাশতা করেই পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলাম।

যাত্রার শুরুতেই বেদনাহত হলাম। মামা-চাচাদের সিঅফ করতে সবাই মিলে যেতাম। কিন্তু হায়! আমাদের কেউ সিঅফ করতে এলো না। যথাসময়ে বিমানে উঠলাম। কিন্তু এ কি? উঠেই আক্কেলগুড়ুম হয়ে গেল।

এটা বিমান? ভেতরে কোনো সিট নেই ঠিক যেন একটা গুদামঘর। প্রচণ্ড শব্দে এঞ্জিন চলছে। ভাবলাম দরজা বন্ধ হলে থেমে যাবে। কিছুক্ষণ পর একজন বিমান সেনা (ক্রু) আমাদের বসার জায়গা করে দিলেন।

আমরা চার ভাই-বোন, বাবা-মাসহ আরো পঞ্চাশ ষাটজন হবেন। বিমানের দেয়াল বরাবর বেঞ্চ। এ দেয়ালে একটি, অপরদিকের দেয়ালে আরেকটি, এমাথা ওমাথা বরাবর পচিশ ত্রিশ ফিট চওড়া দুটো বেঞ্চে সবাই বসলাম।

যথাসময়ে বিমান ছাড়লো। কিন্তু এ কি? শব্দ আর থামে না বরং এতো বেড়ে গেল যে পাশের জনের কথাও শোনা যায় না। প্রচণ্ড চিৎকার করেও পাশে আমার বোন খোশনূরের কোনো কথাই শুনতে পেলাম না। সে সম্ভবত ভয় পেয়েছে। সে যে আমার ডান হাত শক্ত করে ধরেছে, ছাড়ার কোনো লক্ষণ দেখতে পাইনি। এতো বিকট শব্দে কিছুক্ষণের মধ্যেই কানে তালা লেগে গেল। উপরে উঠে বিমানটি খুব বেশি বাম্প করতে লাগলো। এরই মাঝে দেখি বাবা তার কলিগদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। অবাক হলাম। আমার পাশের জনের কথা শুনতে পাচ্ছি না আর তারা গল্প করছেন। ঘণ্টাখানেক পর আমরা বিমানবাহিনীর নির্দিষ্ট রানওয়েতে নামলাম। নামলাম একরাশ হতাশা নিয়ে। কোথায় এয়ারহস্টেস আর কোথায় মজার খাবার! খোশনূর সেই বিমানের নাম দিয়েছিল *আকাশ ট্রাক*।

এবার আসি *আকাশ ভেলার* গল্পে। এটি অবশ্য আমার দেয়া নাম। ১৯৯৮ সালের বন্যায় একবার চট্টগ্রামে আটকা পড়লাম। জায়গায় জায়গায় রেললাইন ডুবে যাওয়ায় রেল চলছে না। বাস বেশ কয়েকদিন ধরেই বন্ধ। তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ঢাকা আসা খুব দরকার। ক্লাস এবং টিউশনি দুটোই নষ্ট হচ্ছে।

বাবা জহুর বেইস–এর বেইস কমান্ডার আংকলকে ফোন করলেন। *স্যার, কি করা যায়?...*।

তিনি বললেন, *নো প্রবলেম।* কাল রুমী আমার সঙ্গে যাবে।...।

এইচএসসির রেজাল্টের কারণে তিনি আমাকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি হলেন এয়ার কমোডর খসরু। পরদিন ভোরে ফিটফাট হয়ে রানওয়েতে এলাম বাবার সঙ্গে। কিন্তু আজ আর বিমান নেই। ভাবছি যাবো কিসে? কিছুক্ষণ পর দেখি হ্যাঙ্গার থেকে ছোট্ট একটি হেলিকপ্টার উঠে এলো। ওয়াও! বাবা বললেন, এটাকে বলে *বেল* <Bell> *হেলিকপ্টার*। দেখতে সুন্দর, জলপাই কালার, ভেতরটাও সুন্দর। বাবা ফিশফিশিয়ে বললেন, জানিস, এটাতে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট চলাফেরা করেন।

আমি ও আংকল হেলিকপ্টারে উঠলাম। খুশিতে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল।

ওমা! এটা দেখি এক জায়গা থেকেই হঠাৎ ওপরে উঠতে শুরু করলো। বেশ মজা লাগলো। আমার ঠোটে সারাক্ষণ হাসি লেগে রইলো। আংকলের সঙ্গে গল্প করছি। এরই মধ্যে একজন বিমান সেনা আমাদের কফি ও স্যান্ডউইচ দিলেন। বাহ! খাবার? হেলিকপ্টার বেশ নিচ দিয়ে যায়।

নিচের গাড়ি–ঘোড়া, এমনকি ভালো করে খেয়াল করলে মানুষও দেখা যায়। হেলিকপ্টারও দোলে। কিন্তু এর দোল অন্য রকম। কোনো ভয় নেই বরং বেশ মজা, আনন্দ!

আংকল যখন শুনলেন আমি কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে পড়তাম তখন বললেন, চলো তোমাকে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের ওপর দিয়ে নিয়ে যাবো।

তিনি পাইলটকে সেই মতো বললেন এবং ঠিকই কিছুক্ষণ পর আমরা কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের ওপর দিয়ে গেলাম। ওপর থেকে দেখতে আমার কলেজ যে এতো সুন্দর আগে বুঝিনি।

সোয়া ঘণ্টা পর আমরা ঢাকায় নামলাম। সত্যিই যেন আকাশে ভেলায় চড়ে বেড়িয়েছি।

ও হ্যা, *চান্দের জিপ*। ওটাও বিমানবাহিনীরই আরেক রকমের হেলিকপ্টার। এটার নাম এমআই সেভেনটিন। এ হেলিকপ্টারগুলো আকারে একটু বড় এবং নিচে চাকা আছে। কিন্তু *বেল হেলিকপ্টারের* নিচে চাকা নেই। বরং দুটো স্ট্যান্ডের মতো কিছু একটা আছে। এ হেলিকপ্টারে

চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার গিয়েছিলাম। বাবা তখন কক্সবাজার এয়ার বেইস–এ পোস্টিং। চট্টগ্রাম থেকে খোশনূর মা ও আমি হেলিকপ্টারে করে কক্সবাজার যাই।

এ হেলিকপ্টারের বৈশিষ্ট হলো এটি একটু শব্দ করে তবে অসহনীয় তো নয়ই বরং এটিও মজাদার। হেলেদুলে পয়ত্রিশ মিনিট পর এটি আমাদের কক্সবাজারে নামিয়ে দিল।

সেবার কক্সবাজারে চান্দের জিপ দেখে খোশনূরের মনে এ নাম আসে এবং সে এমআই সেভেনটিনের নাম দেয় *চান্দের জিপ*।

বিমানবাহিনীর কর্মকর্তা বা কর্মচারী কিংবা তাদের ছেলেমেয়ে অনেকেরই আমার মতো অভিজ্ঞতা আছে, তাই না?

বাবা বিমানবাহিনীতে ছিলেন বলেই হয়তো আকাশে ওড়ার খায়েশ মেটাতে পেরেছি, হোক সে *আকাশ ট্রাক* বা *আকাশ ভেলা*।

নিউ ডিওএইচএস, ঢাকা থেকে

হাতছানি

তাহমিনা আবসার

প্রতিটি শিশু প্লেনের শব্দ শুনলেই আন্দোলিত হয়ে ওঠে। দৌড়ায় কোথা থেকে দেখা যাবে সেই স্বপ্নের বাহন। প্লেনে ওঠার স্বপ্ন দেখে সব শিশু। আমিও সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতে বড় হয়েছি। সেই স্বপ্ন একদিন সত্যি হয়ে গেল।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা। প্লেনে যেতে প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগে। সময়টা হয়তোবা মুক্তিযুদ্ধের পর পরই হবে। ক্লাস এইট বা নাইন–এর ছাত্রী আমি। আমার শখ পূরণে এগিয়ে এলেন বড়চাচা। সে সময় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের প্লেন ভাড়া ছিল সম্ভবত ষাট টাকা।

এখন সেটা মনে হয় স্বপ্ন। দুরু দুরু বুকে প্লেনে উঠলাম। যা দেখি প্লেনের ভেতরে সবই ভালো লাগে। এয়ারহস্টেসের দিকে চেয়ে থাকি অপলক আহা এরা কতো স্মার্ট। হালকা নাশতা সার্ভ করেছিল হস্টেস।

বড়চাচা কৌতুক ভরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিরে ভয় পাচ্ছিস?

কিশোরী বয়স। আনন্দ ভয় সব কিছু মিলেমিশে একাকার, বলেছিলাম না কাকা।

তারপর দীর্ঘ বিরতি, দেশের ভেতরে আর চড়া হয়নি।

১৯৮২ সালে রেঙ্গুন, ব্যাংকক, হং কং হয়ে জাপান যাত্রা। তখনই ভালোভাবে বোঝা গেল প্লেন ভ্রমণ কি একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। তবে আবহাওয়া ছিল চমৎকার। ব্যাংককে যাত্রা বিরতিতে অভিজাত হোটেলে এক রাত ছিলাম। রাতে ইনডিয়ান রেস্তোরা খুজে ডিনার সেরেছিলাম। যদিও ছিলাম সদ্য বিবাহিতা এবং সঙ্গে স্বামী। কিন্তু দেশ ছাড়ার বিরহে ছিলাম কাতর।

আবার হং কংয়ে যাত্রা বিরতি একরাত। রাত নয়টা বা দশটায় পৌছেছি। হং কং এয়ারপোর্ট একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেষে। তাই প্লেন যখন নামছে, মনে হচ্ছে সরাসরি সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। অবশেষে সাগরের কোল ঘেষে আলোক উজ্জ্বল হং কং এয়ারপোর্টে নিরাপদে নেমে হাপ ছেড়ে বাচলাম।

রাত প্রায় এগারোটা। পরদিন খুব ভোরে ফ্লাইট। তাই এতো রাতেই বের হলাম হং কং দর্শনে সঙ্গে কিছু কেনাকাটা।

হং কংয়ের একটা বিশেষত্বের কথা এখানে না বলে পারছি না। প্রায় মধ্য রাত হং কংয়ের রাস্তায় জনস্রোত দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দেখে মনে হচ্ছে সবে সন্ধ্যা, এমনকি বাজারে বেশ কয়েকজন প্রেগনান্ট মহিলার সঙ্গে দেখা যারা নিশ্চিন্ত মনে বাজার করে বেড়াচ্ছেন। অথচ জাপানে গিয়ে দেখলাম অন্য ব্যাপার। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সব ডিপার্টমেন্ট স্টোর বন্ধ। শুধু বার, কফি শপ, ম্যাকডোনাল্ডস ইত্যাদি খাবারের দোকান খোলা থাকে।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

আকাশী রোগী

মোহাম্মদ নাসিমুল ইসলাম

ছোটবেলায় স্বপ্ন দেখতাম নামি-দামি ডাক্তার হবার। মেডিকালের ছাত্র অবস্থায় হাজারো স্বপ্ন ঘুরে বেড়াতো আমার চারপাশে। পাস করার পর মেডিকাল অফিসার হিসেবে গ্রামের উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে একটি শর্তে প্রেষণে সদর হাসপাতালে কাজ করার সুযোগ পেলাম। আমাকে মেডিকোলিগাল কাজ অর্থাৎ ময়নাতদন্ত করতে হবে।

শর্ত মানতে সেই যে ময়নাতদন্ত শুরু হলো আর থামাথামি নেই। চলছে তো চলছেই। কখনো দেশে কখনো বা বিদেশে এই যা পার্থক্য। এর মাঝে এ বিষয়ে ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রিটাও নেয়া হয়ে গেছে। আমি হয়ে গেছি এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। পেয়েছি আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও স্বীকৃতি।

বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকে এখন উড়ে বেড়াতে হয় এখানে-সেখানে। কখনো তা হয় আনন্দময় আবার কখনো বড্ড একঘেয়ে।

সেবার সিংগাপুর এয়ারলাইনস্সে যাচ্ছিলাম আমার ভূতপূর্ব কর্মস্থল সামোয়া-তে। উদ্দেশ্য কোর্টে সাক্ষ্য দেয়া। রুটটা ছিল ঢাকা-সিংগাপুর-সিডনি-অকল্যান্ড-আপিয়া। সিংগাপুর-সিডনি বিশাল অংশের যাত্রা সবে শুরু হয়েছে।

আমি নিজ সিটে হেলান দিয়ে সেদিনের সংবাদপত্র পড়ছি। কানের কাছে ইংরেজিতে কে যেন হঠাৎ বলে উঠলো, তুমি কি ডাক্তার?

তাকিয়ে দেখি বিমানের ক্যাপটেন আমার সিটের খুব কাছে এসে আমাকেই প্রশ্নটি করেছেন। আমি একটু প্রস্তুতি নিয়ে উত্তর দিলাম, জি হ্যা।

আমাদের এক যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তুমি কি অনুগ্রহ করে তাকে একটু দেখবে? এই ফ্লাইটে তুমিই যে একমাত্র ডাক্তার।

নিশ্চয়ই।

ক্যাপটেনের নির্দেশিত পথে পা বাড়ালাম।

আগেই বলেছি, আমি একজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ। সাধারণত অস্বাভাবিক কোনো মৃত্যু হলে আমার ডাক পড়ে। সে ডাকে সাড়া দিতে আমি স্বস্তিও বোধ করি। সেখানে পরীক্ষা করে আমাকে বলে দিতে হয় মৃত্যুর কারণ আর ধরন।

কিন্তু আজ যে রোগী দেখতে আমায় ডাকা হয়েছে তাতে আমি বেশ অস্বস্তিতেই পড়লাম। রেজিস্টার্ড চিকিৎসক হিসেবে যে কোনো রোগী পরীক্ষা করার যোগ্যতা থাকলেও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হতে গিয়ে বহুদিন ধরে শুধুমাত্র মৃতদেহের সঙ্গেই আমি সম্পৃক্ত। ফলে জীবিত রোগীকে

পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে এখন নিজের ওপরই আমার আস্থা নেই। কে বোঝাবে তাকে আমার এই সীমাবদ্ধতার কথা। তারপরও সেখানে আমিই যে সর্বোত্তম। আমাকে পেয়ে ক্যাপটেন আর রোগীর আত্মীয়স্বজন যেন হাতে চাদ পেলেন।

জানতে চাইলাম, স্টেথস্কোপ আর ব্লাড প্রেশার মাপার যন্ত্রের কথা। জানলাম সব আছে। দেখলাম, ছোটখাটো একটি ফার্মাসিও আছে এই প্লেনের ভেতর। অসুস্থ যাত্রীদের সেবায় অত্যাবশ্যকীয় সকল ওষুধই সেখানে আছে।

কাছে গিয়ে বুঝলাম রোগী বিশ বাইশ বছর বয়স্ক শাদা চামড়ার মেদবহুল একজন মহিলা। উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজন আর বিমানের ক্রুরা তাকে ঘিরে রেখেছে। সে শুয়ে আছে এয়ারহস্টেসদের হাটাচলার স্থানে। তার বিশাল দুচোখ যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। ঘন ঘন শ্বাস নেয়া দেখে মনে হচ্ছিল সুনামির এপিসেন্টার যেন তার শরীরে। বিদায়ী শ্বাসের ক্ষণ সমাগত। দেরি না করে স্টেথস্কোপ কানে লাগিয়ে রোগিণীর শ্বাসকষ্ট বোঝার চেষ্টা করলাম। প্লেনের শব্দে কিছুই শোনা গেল না। ব্লাড প্রেশার মাপার চেষ্টা করলাম। সেখানেও লাভ হলো না একই কারণে। মুখমণ্ডলের বিন্দু বিন্দু ঘাম আর নীলাভ মেকআপের সমন্বয়ে মনের অজান্তে জিজ্ঞাসিত হলো হার্ট অ্যাটাক নয়তো! হাই ভলিউম পালস বিটে সে ধারণা পরিত্যক্ত হলে সাধারণ জ্ঞানের ব্যবহারে ক্যাপটেনকে অক্সিজেন দেয়ার ব্যবস্থা করতে বলে নিজ সিটে এসে বসলাম।

দীর্ঘ দিন বিদেশে থাকার অভিজ্ঞতায় ডাক্তারের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে আমি পরিচিত। যে কোনো মৃত্যুতে ডাক্তারের দায় কতোটুকু তার পরিমাপ আমার স্পেশিয়ালিটিভুক্তও বটে। রোগিণীর রোগ নিয়ে ভাবতে গিয়ে নিজের হার্ট অ্যাটাক হবার দশা। এক ধাপ এগিয়ে ভাবছিলাম মৃত্যুর কারণ কি হতে পারে!

বিমানের ক্যাপটেন আবার হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে বললেন, ডাক্তার, রোগিণীর অবস্থা খুবই খারাপ। প্লিজ, আরেকবার এসো।

এদিকে এক কান দুকান হতে হতে প্লেনের সকল যাত্রীই একজন সহযাত্রীর অসুস্থতার কথা জেনে গেছে। আরো জেনেছে, বিমানে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও আছেন। সবাই যেন হাফ ছেড়ে বেচে গেছে আমার উপস্থিতিতে। কেউ জানলো না বা জানার চেষ্টাও করলো না আমার স্পেশিয়ালিটি। আমি বুঝলাম, মহা সমস্যায় পড়ে গেছি। সামনে এগুনো ছাড়া অন্য কোনো পথ অবশিষ্ট নেই। পাসপোর্ট আর টিকেটে ডাক্তার লিখেই ফেসে গেছি। নিজের ভেতরের অবস্থা যাই হোক না কেন অতি দ্রুত রোগিণীর উদ্দেশে রওনা দিলাম। সিট থেকে উঠে দাড়াতেই সহযাত্রীরা আশান্বিত হয়ে উঠলো।

আমি রোগিণীর পাশে দাড়ালাম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো অবস্থা বেশ খারাপ। শ্বাসকষ্টও বেড়েছে। সৃষ্টিকর্তার ওপর রাগ হলো। যে যাবার তাকে নিয়ে গেলেই হয়! টানাহেচড়ার কি দরকার। অবস্থা যা দাড়িয়েছে, আধমরা এ রোগিণী না আবার আমার মানসম্মান সঙ্গে নিয়ে ইহলোক ছাড়ে! অক্সিজেন সিলিন্ডার পরীক্ষা করার জন্য এক বাটি পানি আনতে বললাম।

বিমানের ক্রুরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

কাউকে বুঝতে দিলাম না আমার এ বাহ্যিক ব্যস্ততার ভেতরে আমি ছিলাম অতীব বিচলিত। বুঝতে পারছিলাম রোগিণীর কিছু একটা না হওয়া পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই।

সকলেই যেন বলতে বাধ্য হয় ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, এ রকম একটা বাড়তি মন্তব্য প্রাপ্তির আশায় নিজেকে ব্যস্ত রাখলাম। পানি আসতেই অক্সিজেনের নল চুবিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম তাতে কোনো বাতাস আসছে না। চশমার ফাক দিয়ে কড়া দৃষ্টিতে ক্যাপটেনের দিকে তাকালাম। ভর্ৎসনা করতে করতে সিরিয়াস হতে উপদেশ দিলাম। সেখানে উপস্থিত যাত্রীরা আমার আন্তরিকতা আর জানবাজি করা মহড়া দেখে অভিভূত হয়ে পড়লো। এ পর্যায়ে অক্সিজেনের সরবরাহ নিশ্চিত হতেই সবাইকে টানা উত্তেজনায় ফেলে রেখে আবার নিজ সিটে ফেরত এলাম। সবাইকে বলে এলাম, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে ডাকতে যেন সংকোচ করা না হয়।

উদ্বিগ্ন সহযাত্রীদের জানালাম, প্রাপ্ত সুযোগ–সুবিধার সর্বোচ্চ ব্যবহারে চেষ্টা করছি। বাকি আল্লাহ ভরসা।

মনে মনে আল্লাহ যেন তাড়াতাড়ি তার সিদ্ধান্ত নেয় সে জন্য প্রার্থনা অব্যাহত রাখলাম।

মাত্র দশ বারো মিনিটের ব্যবধানে আমিসহ সকল যাত্রীকে অবাক করে শুধু অক্সিজেনের বদৌলতে রোগিণীর শ্বাসকষ্ট দূর হলে সে উঠে দাড়ালো।

সারা বিমান করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের প্রশংসায় সকলেই পঞ্চমুখ। ওভারহেড মাইকে নিজের গুণগান শুনতে পেলাম।

অচেনা পরিবেশে নিজের অজ্ঞাতে আমার মানসিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলো। ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে গেলাম একজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ। গম্ভীরভাবে সংবাদপত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। রোগিণী আমার কাছে এসে ধন্যবাদ জানাতে থাকলো।

আমিও বিনয়ের সঙ্গে তাকে সাহায্য করতে পেরে আমার আনন্দের কথা জানালাম।

সে চলে যেতেই ক্যাপটেন এসে হাজির হলেন। এবার সে এয়ারলাইন্সের নিয়ম অনুযায়ী আমাকে আমার সম্মানী নিরানব্বই আমেরিকান ডলারের স্কাই শপিং ভাউচার দিলেন আর দীর্ঘ যাত্রাপথ আপগ্রেডেড করে বিজনেস ক্লাসে উন্নীত করলেন।

মালয়শিয়া থেকে
islammn@yahoo.com

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আরিফ

প্রিয় মানুষকে হারিয়ে ফেলা বা তার থেকে দূরে থাকাটা কি যে বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক তা আমার উপলব্ধি করার দুর্ভাগ্য হয়েছিল। তবে খুব অল্প বয়সে এবং আশ্চর্য হলেও সত্যি উড়োজাহাজ বা এরোপ্লেনের মধ্যে। আজ যখন হারানো বিজ্ঞপ্তি শুনি তখন মনে পড়ে যায় সেই দিনের কথা। তখন আমি খুব ছোট সাত কি আট বছর হবে। আমি, আমার ছোটভাই ও আম্মু যাচ্ছি আব্বুর সঙ্গে দেখা করতে।

আব্বু একজন ডাক্তার। সউদি আরবে কর্মরত ছিলেন। ফ্লাইট ছিল রাত এগারোটার সময়। আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে ফ্লাইটের আগের দিন থেকেই একটা আনন্দ বয়ে চলছিল। এক হলো আব্বুর সঙ্গে দেখা হবে ছয় মাস পর আর অন্যটি হলো প্লেনে চড়ার আনন্দ। নির্দিষ্ট দিনে আমরা

অর্থাৎ আমি, আম্মু ও ছোটভাই এয়ারপোর্টে পৌছালাম রাত আটটার সময়। এয়ারপোর্ট যে এতো বড় হয় তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমরা দুভাই এয়ারপোর্টের মধ্যে আনন্দ করছিলাম।

কি যে আনন্দ লাগছিল তখন। নানান দেশের, নানান বর্ণের মানুষ দেখে সত্যিই আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম।

এরপর আমরা প্লেনে উঠলাম। সউদি এয়ারলাইন্সের সেই বিশাল দোতলা প্লেনটিকে ছোটভাইয়ের কাছে একটা বড় পাখির মতো মনে হয়েছিল। সে বার বার বলছিল, আমরা একটা বড় পাখির পেটে কেন ঢুকছি? এটা করে আমরা কিভাবে যাবো ইত্যাদি বহু প্রশ্ন।

বলে রাখা ভালো, ছোটভাইয়ের বয়স তখন তিন কি চার হবে। প্লেনে ওঠার পর যখন প্লেন ছাড়ালো তখন আমি ও আমার ভাই অবাক বিস্ময়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। সব কিছু কেমন যেন ছোট হয়ে আসছিল। ঠিক যেন খেলনার মতো। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, গাড়ি, গাছপালা সব আমাদের বাসায় রাখা খেলনাগুলোর মতো মনে হচ্ছিল। প্লেন ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যে আম্মু ঘুমিয়ে পড়লো তার নাকি মোশন সিকনেস (Motionsickness) আছে। তখন আমি এসব বুঝতাম না। পরে শুনেছিলাম তিনি প্লেনে ওঠার আগে ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিয়েছিলেন।

আম্মু ঘুমিয়ে পড়াতে আমাদের বেশ সুবিধা হলো। দুভাই দুষ্টুমি করার প্রচুর সুযোগ পেলাম। এর মাঝে প্লেনের টিভি স্ক্রিন চালু হয়ে যাওয়াতে দুভাই টিভি দেখতে মশগুল হয়ে গেলাম। টিভি দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা মনে নেই। যখন উঠলাম তখন দেখলাম প্লেনের বড় বড় বাতিগুলো নেভানো, হালকা আলো পুরে প্লেন জুড়ে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে যখন পাশে তাকালাম যা দেখলাম তাতে তো আমার আত্মা উড়ে যাবার জোগাড়। দেখলাম আমার ভাইয়ের খেলনা গাড়িটি আছে তবে ভাই নেই। কোথায় গেল ও। এই অচেনা প্লেনে কিভাবে আমি তাকে খুজে পাবো।

তাড়াতাড়ি আম্মুকে ডাকাডাকি শুরু করলাম। কিন্তু কোনো লোভ হলো না। কারণ আম্মু তখন গভীর ঘুমে অচেতন। কি আর করা। সিট থেকে নেমে নিজেই খোজাখুজি শুরু করলাম। প্লেনের এ মাথা থেকে ও মাথা দৌড়াদৌড়ি করে ছোটভাইকে খুজছি। এরমধ্যে টয়লেটগুলোতেও খুজেছি। কিন্তু কোথাও খুজে পাচ্ছিলাম না ছোটভাইকে। আমার গতিবিধি এয়ারহস্টেসের কাছে সন্দেহজনক লাগছিল। তাই এক পর্যায়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, What is wrong kid? হোয়াট ইজ রং কিড? কি হয়েছে?

তখন আমি ইংরেজি বুঝতাম না। তাই আমতা আমতা করে বললাম, My brother, My brother. মাই ব্রাদার। মাই ব্রাদার। আমার ভাই।

তিনি বললেন, What happend to your brother? হোয়াট হ্যাপেনড টু ইয়ার ব্রাদার? তোমার ভাইয়ের কি হয়েছে?

এর উত্তর কি দেবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এ সময় দেবদূতের মতো আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন এক আংকল। তিনি আমায় বাংলায় জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার বাবু, কি হয়েছে?

প্রানে পানি পেলাম। বললাম, আংকল আমি আমার ছোটভাইকে খুজে পাচ্ছি না।

এ কথায় তিনি আশ্চর্য হলেন। বললেন, প্লেনে বাচ্চা হারাবে কিভাবে। ঠিক আছে চলো খুজে দেখি।

তখন আমি ওই আংকল এবং এয়ারহস্টেস মিলে ছোটভাইকে খোজা শুরু করলাম। পুরো প্লেন, প্রতিটি সিট, টয়লেট, কিচেন সব জায়গা খুজলাম, কোথাও সে নেই। এর মধ্যে আমার আম্মুকে ঘুম থেকে জাগানো হয়েছে। তিনি আমার ভাইকে পাওয়া যাচ্ছে না এ সংবাদ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

এ সময় এয়ারহস্টেজ বললেন, উই শুড অ্যানাউন্স হিজ নেম।

আংকলও বললেন, অ্যানাউন্স করাটাই ভালো হবে।

এয়ারহস্টেস আন্টি বার বার আমার ভাইয়ের নাম বলে অ্যানাউন্স করলেন।

আংকল বাংলাতে বললেন, একটা হারানো বিজ্ঞপ্তি। একটি তিন থেকে চার বছরের বাচ্চা ছেলে হারানো গিয়েছে, তার নাম সৌম্য। যদি কেউ তাকে খুজে পান তবে এখনই তাকে ইকনমি ক্লাসের ফ্রন্টে নিয়ে আসুন।

সে সময় আমার অবস্থা যে কি হয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তখন আমার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে, কোনোভাবেই আটকাতে পারছি না। ঠিক সে সময় আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। আচ্ছা দোতলা বাসের মতো প্লেনেও কি দোতলা আছে নাকি? যেই ভাবা সেই কাজ। আংকলকে বললাম, আমার ভাবনার কথা।

আংকল বললেন, মন্দ ভাবোনি। চলো প্লেনের দোতলাটা সার্চ করি।

সবাই সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিলাম প্লেনের দোতলার দিকে। দোতলায় উঠে প্রতিটি সিটে খুজতে লাগলাম।

হঠাৎ পেছনের একটা সিটে আমাদের চোখ আটকে গেল। দেখতে পেলাম ছোট একটা জিনিস কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। ওপরে চাদর দিয়ে ঢাকা। আংকল চাদর সরিয়ে দিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো আমার ছোটভাই। দেখলাম সে ও আমার বয়সী আরেকটি ছেলে একজন আরেকজনকে ধরে শুয়ে আছে। তাদের দুজনের হাতেই খেলনা পিস্তল।

ভাইকে পেয়ে আমার খুশির কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। আম্মাতো খুশিতে পাগল হয়ে গিয়েছিল। পরে ছোটভাইয়ের মুখ থেকে শুনেছিলাম, সে আমাকে ও আম্মুকে ঘুমাতে দেখে নিজেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিল এবং সিড়ি দেখে দোতলায় উঠে যায়। সেখানে একটা ছেলেকে বন্দুক নিয়ে খেলতে দেখে সেও তার সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে। পরে কখন যে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছে তা তার মনে নেই।

সেদিনের সেই সময়ের কথা আমি কখনোই ভুলবো না। আর ভুলবো না আকমল আংকল ও এয়ারহস্টেস সারা আন্টির কথা। তারা আমাদের ওই সময় প্রচুর সাহায্য করেছিলেন।

আজ প্রায় তের বছর পরও যখন কোনো হারানো বিজ্ঞপ্তি শুনি তখন মনে পড়ে সেই দিনের সেই এক ঘণ্টার স্মৃতি। যে সময়টুকুতে আমি আমার অতি প্রিয় ভাইকে হারিয়ে একা হয়ে পড়েছিলাম। এখন আমার ভাই কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। দোয়া করি মহান খোদাতালার কাছে ছোটভাই যেন কখনোই হারিয়ে না যায় আমার জীবন থেকে।

মোহাম্মদপুর থেকে
arifaminxxx@yahoo.com

আমিত সানা

শাহীন সুলতানা

গত বছর ৪ এপৃল দুলাভাই কলকাতার অ্যাপোলো হসপিটালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হন এবং ১৭ এপৃল মারা যান। তার মরদেহ ১৯ এপৃল বাংলাদেশ বিমানে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ার পর আমার আপা ১৮ এপৃল সকাল দশটার ফ্লাইটে দেশের উদ্দেশে রওনা হন। আপার একমাত্র মেয়ে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে তখনো জানে না বাবাকে হারানোর খবর।

এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন লাউঞ্জে বসে তিনি চিন্তিত, কিভাবে মেয়েকে খবরটা জানাবেন, সান্ত্বনা দেবেন। তিনি খেয়াল করলেন ইনডিয়ান আইডলের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী আমিত সানাকে ঘিরে রয়েছে অটোগ্রাফ শিকারিরা। এক ভদ্রলোক মোবাইল ফোন আমিত সানাকে দিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুরোধ করলেন এবং আমিত সানাও হাসিমুখে ফোনে ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে কথা বললেন।

উল্লেখ্য, প্রথম ইনডিয়ান আইডল অনুষ্ঠানটি সনি চ্যানেলের মাধ্যমে এ উপমহাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়, বিশেষ করে কিশোরীদের কাছে। আমার আপার মেয়েও আমিত সানার ব্যক্তিত্ব ও গায়িকীর জন্য তার ভীষণ ভক্ত। আপা মেয়ের জন্য অটোগ্রাফ চাইলে আমিত সানা গৎবাধা অটোগ্রাফ দিলেন। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত আপা তখনো জানেন না আমিত সানা দেশের বাইরে প্রথম একটি কনসার্টে অংশ নেয়ার জন্য একই ফ্লাইটে বাংলাদেশে আসছিলেন।

আমিত সানা ইকনমি ক্লাসের একেবারে প্রথম আসনটিতে বসেন এবং তার পাশের আসনটি শূন্য। এয়ারহস্টেসকে ডেকে আপা তার সঙ্গে কথা বলার অনুমতি চাইলে তিনি কর্তৃপক্ষের নিষেধ আছে বলে জানালেন। নিজের পরিস্থিতি জানিয়ে আবার অনুমতি চাইলে এয়ারহস্টেস দেখি বলে চলে যান।

কিছুক্ষণ পর অনুমতি পেয়ে আপা আমিত সানার পাশের আসনটিতে গিয়ে বসেন। নিজের কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দেশে স্বামী হারিয়ে দেশে ফিরছি। আমার মেয়েকে তার বাবা হারানোর খবরটা কিভাবে জানাবো বুঝতে পারছি না। আমার মেয়ে তোমার গানের একনিষ্ঠ ভক্ত। তুমি কি আমাকে কোনোভাবে সাহায্য করবে?

আমিত সানা আপার মানসিক অবস্থা ও কথা শুনে কাগজ চাইলেন। আপা ব্যাগ হাতড়ে বোর্ডিং কার্ড ছাড়া কোনো কাগজ না পেয়ে সেটাই দিলেন। বোর্ডিং কার্ডের পেছনে আমিত সানা লিখলেন–

Dear Z,

I know things are very tough for u. But u r a strong girl and this is the examination that u have to pass and prove urself, ur dad is still with u, watching u (now even more). So just wait, weep and then prove urself.

I am with U.

from Amit Sana.

মেয়ে স্কুল থেকে ফিরে জানতে পারলো গতকাল সে চিরদিনের জন্য অতি প্রিয় বাবাকে হারিয়েছে। সারা দিনের ধকলের পর মেয়ে যখন বিছানার এক কোণায় জড়সড়ো হয়ে মূর্তির মতো বসে ছিল তখন আপা বোর্ডিং কার্ডটা বের করে তার হাতে দিলেন।

অনিচ্ছায় হাতে নেয়া কার্ডটি পড়ার পর উপরে আমিত সানার স্বাক্ষর দেখে প্রথমে খুব অবাক হলো। পরে কিভাবে কেমন করে কোথায় পেলে নানান প্রশ্ন করতে করতে মেয়ের বিষণ্ন, মলিন ব্যথাতুর মুখের হাসি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো।

শ্রদ্ধেয় দুলাভাইয়ের স্মরণে এ লেখাটি লিখছি। সেই সঙ্গে আমিত সানাকেও স্মরণ না করে পারছি না। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আমিত সানা।

পল্লবী, মিরপুর থেকে

হেলেন

ইশরাত জাহান সাগরিকা

এক.

খুব ছোটবেলায় মা রাগারাগি করলেই বাসা থেকে বের হয়ে যেতাম। সঙ্গে নিতাম বইয়ের ছোট একটা সুটকেস যার মধ্যে থাকতো একটা আদর্শলিপি, স্লেট, চক আর একটা হাফপ্যান্ট। রাস্তা দিয়ে হাটতে থাকতাম আর পেছন পেছন দৌড়াতে থাকতেন ভাইয়া। পাড়ার মধ্যে সবাই হাসিমুখে দৃশ্যটা দেখতো। কারণ এটি ছিল প্রায় প্রতিদিনের স্বাভাবিক দৃশ্য।

দুই.

লম্বা একটা কাগজ দুদিকে ভাজ করে বানাতাম প্লেন। সেই প্লেন ছুড়ে দিতাম শূন্যে। হাওয়ায় ভাসতো। খুব মজা পেতাম সে সময়। ছোটবেলায় কিভাবে যেন হেলেন নামটা মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। রাগ করে বাসা থেকে বের হলেই আকাশের দিকে তাকাতাম আর বলতাম, হেলেন, আমাকে নিয়ে যাও। যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদে কোনোদিন কোনো প্লেন আকাশের দেখতাম তাহলে তার পেছন পেছন ছুটতাম আর বলতাম, হেলেন, হেলেন, আমাকে নিয়ে যাও।

তিন.

বড় হয়েছি, বুঝতে শিখেছি। কিন্তু আজো আকাশে প্লেন দেখলে সেই ছোটবেলার হেলেনের কথা মনে পড়ে। মাটিতে দাড়িয়ে আজো অপলক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্লেন দেখি। সৌভাগ্য হয়নি আকাশে বসে মাটি, নদী, ফসলে ভরা মাঠ দেখার। কিন্তু সৌভাগ্য হয়েছে নদী ও ফসলের মাঠ থেকে প্লেন দেখার।

আমাদের মতো গরিব দেশের অধিকাংশ মানুষই এভাবে মাটি থেকে শূন্যের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্লেন দেখে। কল্পনায় আকাশ স্পর্শ করে। একদিন এই মানুষগুলোর স্বপ্ন পূরণ হবে। আকাশে বসে মাটির সৌন্দর্য দেখবে এ আশাতেই যে যার মতো অপেক্ষা করে। এই অপেক্ষমাণ মানুষের দলে আমিও একজন।

ঢাকা থেকে

মেঘনার জন্য

এম. সাকিল মাহাবুব

মাথাটি আমার বেশ বড়। মা রসিকতা করে বলতেন, সোয়া সেইরা মাথা। বড় মাথা আমার প্রাত্যহিক জীবনে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেনি সত্য তবে আমাকে সাতার শিখতে দেয়নি।

সাতার শিখি এগারো বছর বয়সে। তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। চাদপুর হাসান আলী সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে প্রাথমিক উত্তেজনায় ভুলেই গেলাম শহরটি দুভাগে ভাগ করা ডাকাতিয়া নদী দিনে দুবার আমাকে পার হতে হবে।

স্কুলে যাওয়ার দ্বিতীয় দিনেই ডাকাতিয়ার খেয়া পাড়ি দিতে গিয়ে অন্য একটি নৌকা দুর্ঘটনা ঘটালো। একজন মারা গেল। আমার পরিবারে শুরু হলো কান্নার রোল। আশ্চর্য!, যিনি মারা গেছেন তিনি আমাদের কেউ না হলেও আমি সাতার জানি না, আমারও একই অবস্থা হবে, এই ভেবে কান্নার আয়োজন। বিশেষ করে বোনদের।

বাবা ছো মেরে আমাকে নিয়ে ফেললেন বাড়ির সামনের দিঘিতে। তারপর সাতার শেখানোর মহড়া। কঠিন ট্রেনিং। বাবা যে কঠোর মানুষ সেটা প্রথম বুঝতে পারলাম।

সাতার শেখার দ্বিতীয় দিনে যখন সের দুয়েক পানি খেয়ে ফেললাম, খকখক করে কাশতে কাশতে চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠলো তখন একবার মনে হয়েছিল বাবাকে খুন করি। গুলতিটা দিয়ে কপাল ফুটো করে দিই।

সাতার শেখার তৃতীয় দিনে আমি ভাসলাম পানিতে। পানি কেটে সামনে এগোলাম। আমি সাতার জানি। সৃষ্টির আনন্দে বাবাকে ক্ষমা করে দিলাম।

আমার চেয়ে পরিবারের আনন্দ যেন আরো বেশি। পানিতে ভাসার আনন্দে গোবেচারা, মুখচোরা আমি দুরন্ত হয়ে উঠলাম। সাতার জানি, পড়াশোনায়ও ভালো, আমাকে আটকায় কে? অবশ্য আমার দুরন্তপনায় কোনো সঙ্গী নেই। আমি একাই বিরাট দুরন্ত।

বাড়ি থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে নদী। পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়ার সঙ্গমস্থল। পুরানবাজার হরিসভা স্কুলের পেছনে মেঘনার বিশাল চর। চরে আছড়ে পড়ছে মেঘনার ঢেউ। সেই ঢেউয়ে সাতার কাটতে না পারলে সাতার শিখে লাভ কি? ছুটলাম মেঘনার বুকে ঝাপ দিতে। মেঘনার জলে পা ভেজালাম। ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিল আমার হাটু। মেঘনার বুকে মাথা রাখলাম। ছুটছি, লুটোপুটি খাচ্ছি, ঝাপ দিচ্ছি, লাফ দিচ্ছি, সাতার কাটছি মেঘনার বুকে। মেঘনার বুকে পিঠ ছোয়ালাম। আমার চোখ এখন মেঘনার বুকে আছড়ে পড়া অনন্ত অম্বরের দিকে।

শরতের নীল আকাশ। হঠাৎ আকাশের অনেক দূর দিয়ে শব্দহীন উড়ে চলা একটা প্লেন আমার চোখ বরাবর এসে থমকে যায়। আমাকে ফিশফিশিয়ে বলে, *এই খোকা এসো, প্লেনে উঠে এসো।*

মেঘনার বুকে সাতার কাটার প্রথম দিনেই আকাশে ভাসার ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসে। প্রতিদিনই ছুটে যাই মেঘনা আর আকাশের বুকে সাতার কাটতে। আকাশে ভাসার বাহন একদিনও চোখে ধরা দেয়নি। কিন্তু ধরা খেয়ে যাই ফ্যামিলির কাছে। নজরবন্দী করা হয় আমাকে। সাঙ্গ হয় মেঘনা আর আকাশের বুকে সাতার কাটা।

এসএসসির টেস্ট পরীক্ষা শেষ। স্কুলে কোচিং চলছে। ব্যাকরণ ক্লাসে হাসিম স্যার একদিন পচাত্তরজনের কাছে জানতে চাইলেন কে কি হতে চায়?

অনেকে অনেক কিছু হতে চাইলো। আমি পাইলট হতে চাইলাম।

স্যার বললেন, ত্রিকোণমিতি তুই ভালো পারিস। সম্ভব হতেও পারে।

চার বছর পর আবার সেদিন চললাম মেঘনাকে ছুতে। মেঘনা চার বছরে আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। অন্তত এক কিলোমিটার। তাতে কি। মন্ত্রমুগ্ধের মতো মেঘনার কাছে যাচ্ছি। মেঘনার সঙ্গে কথা বলছি। মেঘনা তোর বুকের অনেক উপরে যদি আকাশ বাহনকে দেখতে পাই তবে তার চালক হবো। আমাকে দেখাবি? যদি দেখাস তাহলে আকাশে ভেসে বেড়াবো, যদি না দেখাস আকাশের পানে চেয়ে থাকবো।

মেঘনার সঙ্গে আমার মিল হলো চার বছর পর। আমরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরলাম। আদর করলাম। মেঘনার যেন জানাই ছিল তার কাছে আমি কি চাইবো। সে আয়োজন সম্পন্ন করলো। আমি আকাশ বাহনের শব্দ পেলাম কিন্তু তাকে দেখলাম না। আমার দুচোখ যখন তাকে খুজছে তখন শুনতে পেলাম মেঘনার কণ্ঠ।

আমার মতো নিঃসঙ্গ থাকতে পারবে? তাহলে আকাশচারী হবে।

তুমি নিঃসঙ্গ কে বললো?

এই যে চার বছর পরে এলে। কি নিঃসঙ্গতায় না কেটেছে এতোগুলো দিন।

তোমাকে এই চার বছর কেউ সঙ্গ দেয়নি?

দেবে না কেন! কিন্তু তোমার মতো না।

আমি নিঃসঙ্গ থাকলে তোমার লাভ?

তুমি আমার কাছে ফিরে ফিরে আসবে।

আচ্ছা মেঘনা, ঠিক আছে। তোমার কাছে ফিরে আসবো বলেই নিঃসঙ্গ থাকবো।

মেঘনা সেদিন তার বুকে ভেসে বেড়ানো প্লেন আমাকে দেখিয়েছিল। আজ অনেক বছর পেরিয়ে গেলেও আমি সঙ্গীহীন এক খেচর। মেঘনা এখনো আমারই।

টঙ্গী, গাজীপুর থেকে

অভাব বোধ

তানবীর

আমি একজন বৃটেন প্রবাসী। উন্নত ও আদিসভ্য দেশ এটি। বিমানে চড়ার অভিজ্ঞতা সেই শিশুকাল থেকে। পর্যটক হিসেবে ঘুরে বেড়িয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য যাত্রা এই প্রথম। যেদিন বাংলাদেশ বিমানে বৃটেনের উদ্দেশে ফ্লাই করলাম সেদিন বুঝতে পারলাম দেশ ছাড়ার কষ্ট।

মাস্টার্স করে সম্মানজনক একটি চাকরি করছি। উচু বেতনের আশায় বাংলাদেশ বিমান, বৃটিশ হাই কমিশনসহ বেশ কিছু জায়গায় চাকরির আবেদন করেছি। এরই মধ্যে পেয়ে গেলাম বৃটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের ভিসা। মনে আনন্দের বন্যা। উচ্চ শিক্ষা এবং অর্থ উপার্জন দুটোই হাতের মুঠোয়। ফ্লাইটের দিন সে কি কান্না যদিও দীর্ঘ দিন ধরে অনেক আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের লোকজন বৃটেনে বসবাস করছেন।

এখানে এসেছি অনেক দিন হলো। কেমবৃজ ইউনিভার্সিটির আন্ডারে দুটি কোর্স সম্পন্ন করেছি এবং এই সামারে আরো দুটি কোর্স সম্পন্ন হবে। কিন্তু মন থাকে সর্বদা বাংলাদেশে। বাংলাদেশের নদীর কলকল ধ্বনি, মুক্ত বাতাস, পাখির কলরব আর সহজ সরল মানুষের অভাব বোধ করি।

বৃটেন থেকে

mtanbira@yahoo.com
ldove28uk@yahoo.com

খেয়া থেকে বিমান

শফিকুল ইসলাম

কচ্ছপের মতো তিনশ বছর না বেচে বাঘের মতো তিন দিন বাচা অনেক উত্তম।

বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শির এবং সর্বশেষ আমার প্রিয়তমার এ ঘ্যান ঘ্যানানিতে কানের ম্যানহোল অপারেশন ক্লিন হার্ট হয়ে গেল।

বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংল্যান্ডের স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার জন্য। বিসিএস-এর জন্য সাধনা করলাম নির্জন নিরালয়ে কয়েক বছর।

শহরের বন্ধুদের খরগোশ গতির ব্যর্থতায় ব্যথিত হয়ে গ্রামীণ কচ্ছপ গতিকে ভালোবেসে নিলাম।

কোনো উপায়ান্তর না দেখে বাংলাদেশের ছাত্রদের পার্ট টাইম জব টিউশনি বেছে নিলাম শেষ নিঃশ্বাসটা রক্ষা করার জন্য। দিনভর কুড়েঘরে বসে ব্যাচ পড়াই, রাত হলে গাছের নিচে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি।

নিঃশ্বাসটা খুব ভারী হয়। অনেক দিন পর শহর থেকে গ্রামে এসেছি। ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলতে কেউ নেই। যারা ছিল তারা আজ ভালো অবস্থানে। কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা বড় ব্যবসায়ী। আবার কেউ আমার স্বপ্নের দেশে বিদ্যা অর্জনে বা টাকা অর্জনে মগ্ন।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সমাজের অনেকের সঙ্গে মিশতে পারি না।

দেখা হলেই *কি মিয়া শেখের পো, শহরের বিদ্যা নিয়ে গ্রামে টিউশনি করাও, এক্কেবারে শ্যাষ হইয়া যাইবা, মাথার চুল তো পড়বো সঙ্গে দাতও পড়বে। অকালে বুইড়া হইবা, এই ভবে বিয়া করতে পারবা কি না সন্দেহ।*

সমাজের এসব কথা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কচ্ছপ এবং কুনো ব্যাঙের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলাম।

পৃথিবীর কোনো কিছুর গতিই সর্বদা এক রকম চলে না। ইতিমধ্যে সিংগাপুর এবং মিডল ইস্ট ফেরত বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। ধূলিময়, বিনোদনহীন, বর্বর আচরণ, অসহনীয় গরম, আলখেল্লা *গল্পের* চেয়ে নগ্ন পোশাক, সারা বছর ঝিরঝির বাতাস, কাজ আর আনন্দ বিনোদন, বাংলাদেশের মেয়েদের মতো ওখানকার মেয়েরা ততো কঞ্জুস না, বড় উদার, হর হামেশাই তাদের সঙ্গে মেশা যায় - এসব গল্পই বেশি শুনতাম।

সিংগাপুর ফেরত বন্ধু এসকানের মুখে এসব কথা শুনে দিনে দিনে সিংগাপুর যাওয়ার একটা ইচ্ছা সৃষ্টি হয় বুকের মাঝে। ইশ! এ কেমন দেশ? কতো দিন হলো বাংলাদেশে এসেছি, একটা মেয়ে কেমন আছেন কথাডা পর্যন্ত বললো না। না, না শফিক, তোমার এ গোসাপের মতো আধমরা জীবন আমার ভাল্লাগে না। তুমি শিক্ষিত ছেলে, এ দেশে এ অবস্থায় মানায় না। একটা চক্কর মারো।

গো টু সিংগাপুর অ্যান্ড এনজয়।

একদিন দুই দিন নয়, তিন বছরে সিংগাপুর যাওয়ার টাকা জমালাম। টিউশনির টাকা কি আর জমতে চায়? একশ বাড়ির এক মুঠ করে চাল জমালে সন্ধ্যা বেলা হয় দুই কেজি।

এসকান আমাকে সাহস দেয়, যাও শফিক, নো রিস্ক নো গেইন। আই উইল হেলপ ইউ।

ছাত্রদের কাছ থেকে এক মাসের অগ্রিম টাকা নিয়ে বললাম, একটা চাকরির জন্য ঢাকা যাচ্ছি। সপ্তাহখানেক বন্ধ আর তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করো।

নিজস্ব লোকদের কাছে ওই একই বয়ান ছাড়লাম।

তার দিক নির্দেশনা নিয়ে ঢাকায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে এনজয়, এনজয়, জপ করতে করতে সিংগাপুরের ভিসার জন্য দাড়ালাম।

টুরিস্ট ভিসা পেতে আমার কোনো কষ্ট হলো না। পকেটে টিকেট ছিল বাংলাদেশ বিমানের।

সিটবেল্ট পরে চুপচাপ ভাবছি, যখন ছাত্র পড়াই তখন আমি শিক্ষক। কিন্তু বিমানে আদর্শ–লিপির ছাত্র। শিক্ষকতার নীতি বর্জন করে সবার কাছে মিথ্যা বলে এসেছি। ভেতরটা খুব ভেজা হয়ে যায়। চোরের মতো থাকতে হবে প্রবাস জীবনে। একটা নিঃশ্বাস বের হয়। নিজেকে সান্ত্বনা দিই এ বলে, অনেক টাকা আয় হবে, এনজয় করবো।

নিমেষেই ঢাকা শহর লিলিপুট নগরীতে পরিণত হলো। জানালায় তাকাই। প্রিয় ঢাকা শহর বিদায়।

থাকগে, ভয় পাইনি তো।

আমি পাশের সিটে তাকাই।

একটা মোটা শাদা কাগজে এক পিঠে বড় অক্ষরে লাল কালিতে লেখা SINGAPORE, অপর পিঠে CHITTAGONG. সে লেখাটা বার বার ঘুরিয়ে ছক আকে। আমার খুব জানতে ইচ্ছা হলো লোকটা কেন কাগজ ঘুরিয়ে লেখাটা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছে।

জিজ্ঞাসা করতেই তার সহজ উত্তর। প্লেনে আহনের আগে মামায় আমারে রাধা চক্করে উঠাইছে। উডন–নামনের সময় যাতে না ডরাই (ভয় পাই)।

আমার দিকে তাকিয়ে সে আরো বললো, *আমনে কিন্তু একটু ডরাইছেন, খিচ* (ঝাকুনি) *মারছেন।*

লেখা কাগজের দিকে ইশারা করতেই *উহ! আমি সিংগাপুর আইছি কি না বুঝমু ক্যামনে? মামায় কইছে প্লেন থেইক্যা নাইম্মা এই লেখাডার সঙ্গে বন্দরের সামনের লাল লেখার সঙ্গে মিলাবি।*

সিংগাপুর না দেখলে বুঝবি *তোরে চিটাগং নামাইছে। খপ্পর কইরা দালাল ধইরা চিল্লাপিল্লা করবি।*

না হেসে পারলাম না।

আমনে হাসেন। মামার মতো আমি বলদ না। মামায় এক দালালের খপ্পরে পড়ছিল। সিংগাপুরের কতা কইয়া তারে চিটাগং নামাইয়া কইছে, তুমি বিদেশ আইছো। তার পরে দালাল টাকা–পয়সা নিয়া ভাগছে। আমারতন টাকা নেওন অতো সহজ না। ভেতরে ঢুকাইবো, শাদা মানুষ দেহুম তারপরে পাসপোর্ট দিমু। বাইততে (বাড়িতে) *ফোন করুম বাকি টাকা দিতে।*

দালাল কই?

হে নেপাল থেইক্যা যাইয়া পোর্টে খাড়াইয়া থাকবো।

এয়ারহস্টেসরা খোজখবর নিচ্ছে। কার কি সমস্যা। মোহনীয় হাসিতে বললো, কিছু লাগবে? প্লিজ।

বললাম, একটা কোক দিলেই চলবে।

লোকটার আসল পরিচয় জানার আগ্রহ বোধ করলাম। কি নাম আপনার?

আবুল মাজন। ঘাটের মাঝি। *নদী হুকাইছে, হের ওপর আবোর বৃজ। সংসারে আকাল পড়ছে। ঘর–দুয়ার বেইচ্যা বৌ বাপের বাড়িতে রাইখ্যা বিদেশ যাইতেছে।*

ভাই একটা হাচা কথা কন তো। ওই যে সুন্দর মহিলা কইলো কিছু লাগবো নি? খাওয়াইয়া কি আবার অজ্ঞান কইরা মালসামানা নিবোনি? খুব ক্ষিদা লাগছে।

আরে না, বিমানে অজ্ঞান করে না।

তয় খাওয়াইয়া টাকা–পয়সা চাইবোনি?

ধ্যাৎ মিয়া। আমি একটু ক্ষেপে যাই। যা চাইবেন তাই পাইবেন। কোনো টাকা- পয়সা লাগবো না।

এয়ারহস্টেস আমার সামনে কোক রেখে বললো, আর কিছু?

মাজন বলে ওঠে, *আরে আমারে দেন না ক্যান? ভালো ভালো সব খাবার আনেন। বৌ কইছে ভালো খাইতে, ভালো থাকতে।*

আমার দিকে তাকিয়ে সে বললো, *টাকা যহন লাগবো না কম খাইয়া কাম নাই।*

একটার পর একটা সে খেয়েই গেল।

রাতের ফ্লাইট। চোখ বুজে একটু ভাবি, সিংগাপুর গিয়ে কোথায় উঠবো?

ঝিমুনি লাগতেই শুনলাম চেচামেচি।

এয়ারহস্টেস বলছে, *এই কুত্তার বাচ্চা, ছোটলোকের বাচ্চা ছাড়, ছাড়।*

মাজনের এমন আচরণে খুব হতবাক হয়ে যাই।

এয়ারহস্টেসকে সে জাপটে ধরে আছে।

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াই।

অবস্থা খারাপ দেখে আমাকে দেখিয়ে মাজন বললো, *উনি আমারে হিগাইয়া দিছে। আমনে কন নাই যা চাইবেন তাই পাইবেন।*

বুঝলাম খেয়া মাঝি আবুল মাজন আকাশকন্যা এয়ারহস্টেসকেই চাইছিল।

ঘটনা সামাল দেয়ার জন্য এয়ারহস্টেসকে বললাম, কিছু মনে করবেন না। সে পাগল। চিকিৎসার জন্য সিংগাপুরে যাচ্ছে।

শরীয়তপুর থেকে

অতৃপ্তি- তৃপ্তি

সীমুন

২০০২ সালে আমার বিয়ে হয়। তার পাচ ছয় দিন পর বিয়ে উপলক্ষে নেয়া ছুটি কাটিয়ে নোমানের (আমার স্বামীর নাম) কর্মস্থল যশোর সেনানিবাসে যাবো। সুটকেস, ব্যাগ গোছানো শেষ। আমরা দুজনও প্রায় রেডি। এমন সময় ওর ইউনিটের এক জুনিয়র অফিসার ফোন করে বললো, স্যার, ভাবীকে নিয়ে কি বাসে আসবেন? দুই দিন আগেই ঢাকা থেকে এসেছি। তখন দেখেছি পাটুরিয়া ফেরিঘাট প্রায় ডুবে গেছে। এ কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। এরই মধ্যে হয়তো বন্ধ হয়েই গেছে।

সে সময় ছিল বর্ষাকাল এবং দেশের অনেক স্থানই বন্যা কবলিত ছিল।

এ খবর শুনে আমার শাশুড়ি, ভাসুর দুজনেই বললেন, এ রকম অনিশ্চয়তার মাঝে নতুন বৌ নিয়ে বাসে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। প্লেনে চলে যাও।

আমাদের দুজনেরই প্রস্তাবটা পছন্দ হলো। কারণ এর আগে আমাদের দুজনার কারোই প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা ছিল না। অবশেষে প্লেনে যাওয়াই স্থির হলো। আমার এক জা ছিলেন জিএমজি–র এয়ারপোর্ট ম্যানেজার। তাকে ফোন করে দুটো টিকেট বুক করলাম এবং সময়টা জেনে নিলাম।

নির্ধারিত সময়ের প্রায় পচিশ ত্রিশ মিনিট আগে এয়ারপোর্ট পৌছালাম। আমার জা তার অফিসের লোক দিয়ে আমাদের সুটকেস, ব্যাগগুলো পাঠিয়ে দিলেন। আমরা তার ক্যাবিনে অপেক্ষা করতে থাকলাম। মনের মাঝে ভয় আর আনন্দের মিশ্র একটা অনুভূতি হতে থাকলো।

যথাসময়ে প্লেনে গিয়ে উঠলাম। বেশ একটু অবাক হলাম, প্লেন এতো ছোট থাকে! ভাগ্যক্রমে একেবারে সামনের দুটো সিট পেলাম। জানালার পাশের সিটে বসলাম। ভয় পাচ্ছিলাম, হয়তো ফ্লাই করার সময় বেশ ভীতিকর অনুভূতি হবে। কারণ তার দুই দিন আগেই নোমান আমাকে ফ্যান্টাসি কিংডমে নিয়ে গিয়ে কিছু বোঝার আগে প্রথমেই রোলার কোস্টারে চড়িয়েছিল। সেই আতংক তখনো মনে ছিল। তাই শক্ত করে তার হাত ধরে থাকলাম।

সে আমার মনের অবস্থা বুঝলো। আমাকে সাহস দেবার চেষ্টা করলো। প্লেন আস্তে আস্তে ফ্লাই করলো। তেমন কিছুই হলো না। স্বস্তি পেয়েই কিছুটা আশাহত হলাম। কিছু পরে প্লেন আকাশে ভেসে যেতে লাগলো। নিচের সব ছোট দেখাচ্ছে। আমাদের পাশ দিয়ে হালকা ছোট ছোট মেঘ ভেসে যেতে লাগলো। গ্রামের ছোট ছোট কুড়েঘরগুলো আরো ছোট দেখাতে সুন্দর লাগলো। নিচে বেশির ভাগই পানি। কারণ তখন বন্যা ছিল। চারপাশে পানির ওপর ভেসে থাকা মহা সড়কগুলো কালো একেবেকে চলা সাপের মতো লাগছিল।

ভালো লাগলে রাস্তার দুপাশে বৃষ্টিতে সতেজ হয়ে যাওয়া সবুজ গাছের সারি দেখে। বুঝলাম আমাদের দেশের মানুষ এখন অনেক পরিবেশ সচেতন হয়েছে। দুজনে ভ্রমণটাকে উপভোগ করলাম। তখন প্রথম অনুভব করলাম, কেন আমাদের দেশের সঙ্গে নদীমাতৃক আর সবুজ শ্যামল উপমা দেয়া হয়। প্রায় আধ ঘণ্টা পর প্লেন যশোর এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলো।

তার ইউনিট থেকে দুজন জুনিয়র অফিসার জিপ নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারা ফুলের তোড়া দিয়ে আমাদের রিসিভ করলো। মেসে ওর রুমে গিয়ে উঠলাম। সবই সুন্দর। কিন্তু মনের মাঝে কেমন একটা অতৃপ্তি ভাব হলো। কেন ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে ওর মেসের এ (আমার না দেখা) রুমটার প্রতি বেশ একটা মোহ ছিল। এখন সেটার প্রতিও ঠিক মন দিতে পারছি না। সে মন খারাপ করবে বলে কিছু বললাম না। অনেক ভেবে বের করলাম অতৃপ্তির কারণ। এতো শখ করে আকাশে উড়লাম, মেঘের সঙ্গে ভাসলাম। কিন্তু মেঘের দেশে হারিয়ে তো যেতে পারলাম না। দৃষ্টিসীমার ভেতর পৃথিবী তো সব সময়ই ছিল!

যদিও এখন বুঝি অভ্যন্তরীণ রুটে স্বল্প সময়ের ছোট প্লেনে কি আর মেঘের দেশে হারিয়ে যাওয়া যায়? তবুও অতৃপ্তিটাই রইলো।

আজ বিয়ের প্রায় চার বছর পর নোমান এখন জাতিসংঘ মিশনে, লাইবেরিয়াতে। সে যাবার সময় আমি বেশ ভালো একটা ডিজিটাল ক্যামেরা গিফট দিয়ে বলেছিলাম, ওই দেশে গিয়ে যে

জিনিস বা জায়গা তোমার ভালো লাগবে কিংবা মনে হবে আমি দেখলে আমার ভালো লাগবে, তার ছবি তুলে নেবে। পরে আমাকে দেখাবে।

সে যাবার দশ বারো দিন পর ই-মেইলে চিঠির সঙ্গে বেশ চমৎকার কিছু ছবি পাঠালো। তার মধ্যে ছিল Yekapa নামে Iron hill এর ছবি। এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় Iron hill গুলোর একটা। গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত বৃজ, হসপিটালের ছবি, লাইবেরিয়ার বিশাল ফরেস্টের ছবি, আইভরি কোস্ট-এর বর্ডারের ছবি। কিন্তু প্রথমেই যে ছবিটা ছিল সেটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো। ওই ছবিটা তুলেছিল প্লেনের জানালা দিয়ে।

তুলার মতো ঘন শাদা থোকা থোকা মেঘের ছবি। নিচের চারপাশে শুধুই মেঘ। মনে হচ্ছিল ও সত্যিই মেঘের ভেতর হারিয়ে গেছে। ছবিটা দেখে আমার এতো দিনের অতৃপ্তিটা নিমেষেই দূর হয়ে গেল।

যাক, আমি না হোক সে তো মেঘের দেশে হারিয়েছে। তৃপ্তিতে ভরে উঠলো মন। এতো দিনে পরিপূর্ণভাবে সার্থক হলো আমাদের আকাশ ভ্রমণ!

রায়েরবাজার থেকে
sheemu5844@yahoo.com